জঙ্গলে জঙ্গলে

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

উৎসর্গ

পূর্ব আফ্রিকা থেকে এসে যে তিনজন হিতৈষীর উৎসাহে আমি বাংলা ভাষা চর্চায় মনোনিবেশ করি—যথাক্রমে নীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, জীবনময় রায় ও হিরণকুমার সান্যাল—এঁদের স্মরণ করে এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম।

নিবেদন

জনপ্রিয় সাহিত্যিক ও "সন্দেশ" পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলা মজুমদারের উৎসাহে আমার অরণ্যবাসের গল্পগুলি প্রকাশিত হলো। তিনি কেবল কাহিনীগুলি লিখে ফেলবার তাগাদা দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন নি, তরুণ শিশু-সাহিত্যিক স্নেহাস্পদ অজেয় রায়কে শ্রুতিধর নিযুক্ত করেছেন। একদিন দেখি প্রথম দুটি অধ্যায়ের খসড়া প্রস্তুত হয়ে গেছে। অতএব বাধ্য হয়ে নিজেই লিখতে শুরু করেছি।

গল্পগুলি "কথাসাহিত্য" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হবার সময় আমি জানতে পারি যে আমার বর্ণিত চরিত্রগুলির অনেকে এখনও সুস্থ ও কার্যক্ষম আছেন। তাঁদের কাছ থেকে আমার স্মৃতির সজীবতা ও যথার্থতা সম্বন্ধে প্রশস্তি-পত্র পেয়ে কৃতার্থ বোধ করেছি।

একমাত্র গোমেশ ছাড়া বাকি সকলকে স্বনামেই প্রকাশ করেছি। অনেকের সাহস, অধ্যবসায় ও কৃচ্ছ্রসাধনার কথা ভাল করে বলা হয় নি। তাঁরা ক্ষুণ্ণবোধ করতে পারেন। আবার অনেকের কথা উল্লেখ করতেই ভুলে গেছি। অর্ধ-শতাব্দী আগেকার সে-যুগে যখন গহন বনের মধ্যে গাড়ি যাতায়াতের পথঘাট ছিল না, সংবাদ-পরিবহনের বেতারযন্ত্রের উদ্ভাবনাও হয় নি, কাছেপিঠে পোস্ট-অফিসও ছিল না, অপঘাত মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রতি পদে, অসহায় বনবাসী মানুষ পরিবার হতেও বিচ্ছিন্ন, চিকিৎসক ও ঔষধপত্রের একান্ত অভাব, তখন তাদের মনের উৎকেন্দ্রিকতার দিকটিই প্রকটিত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। আমি হয়তো সেই দিকটি মাত্র প্রকাশ করে চরিত্রগুলিকে অসম্পূর্ণ রেখেছি, কিন্তু সে দোষ আমার স্মৃতির। অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত নয়।

কোন কোন পাঠক বলেছেন যে, আমি অর্ধশতাব্দীর বনবাসের প্রথম দিকটিকেই কেবল সবিস্তারে বলবার চেষ্টা করেছি। পরবর্তীকালের বিপুল পরিবর্তনের যুগকে অপ্রকাশিত রেখে কয়েকটি মাত্র গল্প বলে দায় শেষ করেছি। এই সমালোচনার যথার্থতা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমি তো ভারতীয় খনিজ-শিল্পের পুরাবৃত্ত লিখতে বসি নি। আমি স্মরণ করেছি মানুষকে।

লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণের নিবেদন

বন্ধুবর প্রশান্তকুমার রায়ের অকাল মৃত্যুর পরে আকস্মিক ভাবে দেখতে পাই তিনি 'জঙ্গলে জঙ্গলে' বইটির প্রথম সংস্করণের কয়েকটি ছবি এঁকে রেখেছেন। ছবিগুলি তাঁর কল্পনাপ্রসূত এবং আমার স্মৃতির সঙ্গে মিল নেই। তবুও আমার বিবরণে অনুপ্রাণিত বলে এই গ্রন্থে জুড়ে দিলাম। অবশ্য স্বর্গত সুহৃদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি হচ্ছে আসল কারণ।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

বাঁদিকে

গোমেস-এর পরলোকগত স্ত্রীকে এমন সুস্পষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম পৃষ্ঠা : ৮৯

ডানদিকে

উত্তমাঙ্গ নগ্ন, তাম্রবর্ণ, স্খলিতচরণ রক্তবস্ত্র পরিহিত লোকটি দরজায় দাঁড়িয়ে। পৃষ্ঠা : ৮৯

একটা মৃতদেহের গায়ে ঠেসদিয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেছি। পৃষ্ঠা ঃ ৭

জঙ্গলে জঙ্গলে

আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে কলকাতার ডালহাউসী স্কোয়ারে একটি উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদ্দেশ্য চাকরি খোঁজা। সদ্য পূর্ব-আফ্রিকা থেকে ভারতবর্ষে এসেছে। সেখানেই তার জন্ম। একবার শৈশবে কয়েক মাসের জন্যে এসেছিল কিন্তু কলকাতার রাস্তা-ঘাট চেনে না। একজনের কাছে খোঁজ পেয়ে সে এসেছিল এক কোম্পানিতে কাজের সন্ধানে। দুঃখের বিষয় তাকে নিরাশ হতে হলো। বড় সাহেব বললেন, "সরি, বড় মন্দা চলছে বাজার। এখন নতুন লোক নেওয়া একেবারে বন্ধ।" হতাশ হয়ে যুবক আবার পথে নামে।

কাজ তার চাই-ই চাই এবং ভারতবর্ষে। ভারতের বাইরে সে কাজের সুযোগ পেয়েছিল। যেতেও প্রস্তুত কিন্তু অভিভাবক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যিনি য়ুগাণ্ডায় থাকেন, তাঁর ইচ্ছে সে এখন থেকে দেশেই বাস করতে আরম্ভ করুক।

গলাটা শুকিয়ে গেছে। তৃষ্ণার্ত হয়ে ফুটপাতের পাশে দোকান থেকে একটা লেমনেড কিনে খেতে খেতে হঠাৎ চোখ পড়লো উল্টোদিকে—বিরাট এক বাড়ির দরজায় পিতলের অক্ষরে লেখা—'বার্ড্ এ্যাণ্ড কোম্পানি'।

নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হলো। পূর্ব-আফ্রিকার মোম্বাসায় এই নামে এক কোম্পানির অফিস সে দেখেছে। কপাল ঠুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে নিজের নামাঙ্কিত একখানা কার্ড পাঠিয়ে দিল।

একটু পরে দেখা গেল স্বয়ং চীফ এ্যাকাউন্টেন্ট সাহেব বেরিয়ে এলেন। যুবকের হাত ধরে নিজের চেম্বারে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, "আসুন, আসুন। আমি জানতাম আপনি আসবেন। সব বলছি আপনাকে—"

যুবক তো অবাক।—"আপনি জানতেন আমি আসবো? কি করে? আপনি কি চেনেন আমায়?"

এ্যাকাউন্টেন্টই বললেন, "না, তা চিনি না। তবে আপনার কার্ড দেখেই বুঝেছি, কেন এসেছেন। সেই কম্বলের ব্যাপারটা তো—"

যুবক বুঝলো কোথায় একটা গণ্ডগোল বেধেছে। কার্ডে তার পরিচয় ছিল সাংবাদিক। আফ্রিকায় থাকতে কিছু কিছু সাংবাদিকতা সে করতো বটে। এ্যাকাউন্টেন্ট নিশ্চয় ভেবেছেন যে সে কোন কাগজের তরফ থেকে এসেছে।

যুবক বুঝিয়ে বলে, "স্যার, আপাতত সাংবাদিকতার কাজ নিয়ে আসিনি। আমি এসেছি একটা চাকরির খোঁজে।"

এ্যাকাউন্টেন্ট হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কোম্পানির আফ্রিকা ব্রাঞ্চে এক কর্মচারী কম্বল বিক্রির বেশ মোটা কিছু টাকা তছরুপ করে সরে পড়ে। তিনি গিয়েছিলেন ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে। ভেবেছিলেন বুঝি কোন কাগজের লোক সেই ব্যাপার প্রকাশ করে দেওয়ার ধান্দায় এসেছে।

সুস্থির হয়ে এ্যাকাউন্টেন্ট যুবকের লেখাপড়া কাজকর্মের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বৃত্তান্ত জানতে চান। শুনে বলেন, "দেখ, আমাদের কলকাতার অফিসে কোন কাজ খালি নেই। তবে হ্যাঁ, চাকরি একটা দেওয়া যেতে পারে। তুমি আফ্রিকা থেকে আসছো, আশা করি বুনো জানোয়ারের ভয় তোমার নেই।"

আশায় উৎফুল্ল যুবক বলে, "কি চাকরি? বলুন?"

স্থিরদৃষ্টিতে যুবকের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সাহেব বলেন, "বন্দুক ছুঁড়তে পার?"

"পারি।"

"এমন জায়গায় যেতে রাজী আছ, যেখানে পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুতে থাকতে হবে? আর প্রতিদিন নিজের হাতে পাখি বা পশু মেরে নিজেদের খাবার যোগাড় করতে হবে?"

"রাজী।"

এ্যাকাউন্টেন্ট উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "ব্যস্, তবে তো তোমার চাকরি হয়ে গেল। এই নাও—", সাহেব যুবককে তৎক্ষণাৎ কিছু টাকা দিয়ে দিলেন পাথেয় হিসেবে। বললেন, সামনের সপ্তাহেই রওনা হতে হবে। স্টার্ক নামে একজন ইংরেজকে ডেকে আলাপ করিয়ে দিলেন। কথা হলো ইনি কালীমাটি (বর্তমান টাটানগর) পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। বাকি পথ কেমন করে যেতে হবে ইনিই বলে দেবেন।

ভারতবর্ষে এই আমার প্রথম চাকরি লাভ।

॥ ২ ॥

আমার গন্তব্যস্থল উলিবুরু। কোল ভাষায় বুরু মানে পাহাড়। গভীর জঙ্গলের মধ্যে সামান্য উঁচু একটি পাহাড়ের মাথার উপর ক্যাম্প পড়েছে। স্থানটি বিখ্যাত সেরেংডা অরণ্যের এক অংশ। সিংভূমের জামদা নামে গ্রামটি থেকে কিছু দূরে, উড়িষ্যার কেওঞ্ঝর করদ রাজ্যের মধ্যে।

কালীমাটিতে গিয়ে স্টার্ক সাহেব আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন। এবার আমায় যেতে হবে একা।

কালীমাটি রেল স্টেশনে এক রাত কাটালাম। এ সময় জামসেদপুরে বহু গুজরাটী কন্ট্রাক্টার রেল লাইন পাতার কাজ নিয়ে বসবাস করছিল। আমাকে তারা কচ্ছ দেশের লোক ঠাউরাল। বোধ হয় আমি ভাল গুজরাটী বলতে পারতাম বলে তাদের এ ধারণা জন্মেছিল। কয়েকজন কচ্ছি ঠিকাদার উপদেশ দিল—"জামদা? খবরদার, যেও না হে। ওখানে গেলে আর কাউকে বেঁচে ফিরতে হয় না। বুনো জন্তু—বাঘ, ভালুক, হাতির উৎপাত, তাছাড়া আছে ভয়ঙ্কর সব রোগ—ম্যালেরিয়া, রক্তআমাশা, ব্ল্যাকওয়াটার। একেবারে যমের দক্ষিণ দুয়ার।"

ভয়-ডর আমার চিরদিনই কিছু কম। তাছাড়া বিপদ জেনেই তো বের হয়েছি। কাজেই ওদের মূল্যবান উপদেশগুলো আমার মনে কোন দাগ কাটতে পারলো না।

কথা ছিল কালীমাটি থেকে ট্রেনে যাব জামদা (বর্তমান রাজখারসোয়ান)। সেখান থেকে ট্রেন বদলিয়ে চাইবাসা হয়ে জামদা। জামদায় তখনও কোন স্টেশন-ঘর তৈরি হয়নি। সবেমাত্র রেল লাইন পাতার কাজ শেষ হয়েছে। জামদা নামকরণটা রয়েছে শুধু কাগজে-কলমে। রেলের লোকেরা বলতো ২৪২নং মাইল পোস্ট। পরে এই স্টেশনের নাম দেওয়া হয় বড় জামদা।

জামদা থেকে যেতে হবে মালগাড়িতে। নতুন লাইন পাতা হয়েছে। তখনও নিয়মিত প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাতায়াত আরম্ভ করেনি। মালগাড়ির সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয় একটা যাত্রীবাহী কামরা। আমাদের মত উটকো প্যাসেঞ্জাররা চাইবাসা অথবা ডাঙ্গোয়াপোসি পর্যন্ত প্রয়োজনমত তাতেই যাত্রী হয়।

চাইবাসা ও জামদার মাঝামাঝি ডাঙ্গোয়াপোসি পৌঁছে শুনলাম ট্রেন আর যাবে না। কারণ সামনে লাইন খারাপ। কবে যে ঠিক হবে তারও স্থিরতা নেই।

মহা মুশকিলে পড়া গেলো। এখন ফেরারও উপায় নেই।

স্টেশন বলতে দেখলাম দূরে দূরে দুটি মাত্র পাকা বাড়ি, তাতে একটি করে ঘর। একটি স্টেশন মাস্টারের বাসস্থান। অন্যটি স্টেশন ঘর। কাছাকাছি কোন লোকালয়ের নামগন্ধ নেই। জায়গাটাতে যাত্রীদের রাত কাটাবার কোন ব্যবস্থাই নেই। স্টেশন মাস্টার অন্ধ্রদেশীয় লোক। সে আমাকে নিয়ে বিব্রত বোধ করছিল। বেশ সোজা কথায় বুঝিয়ে দিল—"দেখুন, আপনার থাকা-খাওয়ার কোন বন্দোবস্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার একটিমাত্র ছোট শোবার ঘর ও একটিমাত্র বিছানা। সুতরাং দ্বিতীয় ব্যক্তির সেখানে জায়গা হবে না। তবে হ্যাঁ, স্টেশন ঘরটায় রাত কাটাতে পারেন। কাল যা হোক কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। হয়ত ফিরে যেতে হবে।"

"আলো? দুঃখিত। বাতিটাতি নেই আমার কাছে। চেয়ারে বসেই রাতটা কাটিয়ে দিন।" এই বলে স্টেশন মাস্টার বিদায় নিল।

সন্ধ্যে হতে অগত্যা আমি সেই ছোট্ট স্টেশন ঘরটিতে গিয়ে ঢুকলাম। ভীষণ খিদে পেয়েছে। খাবার বলতে সঙ্গে মাত্র একটি ফ্রুট কেক। তার থেকে কয়েক টুকরো ভেঙে মুখে পুরলাম। কুয়ো থেকে জল তুলে খেলাম। কিন্তু খানিকক্ষণ সেই ঘরে বসেই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম।

ভীষণ মশা। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা আমায় আক্রমণ করল। অতিষ্ঠ হয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে এলাম। লাইনের ধারে পায়চারি করতে থাকলাম। ঘরের বাইরে একপাশে একটা কাঠের বেঞ্চে দেখি একজন লোক আগাপাস্তলা মুড়ি দিয়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। তার মাথার কাছে সামান্য জায়গায় জড়সড় হয়ে বসলাম।

বাইরে আবছা জ্যোৎস্না। চন্দ্রালোকে উন্মুক্ত প্রান্তর, ঝোপ-ঝাড়, দূরে পাহাড়-জঙ্গলের সীমারেখা দেখা যাচ্ছে। এই অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আবিষ্ট হয়ে পড়লাম।

লোকটা কিন্তু দারুণ ঘুমুচ্ছে। মাথায় ঠেলা খেয়েও একবারও নড়লো না। ভাবলাম নিশ্চয় রেল কোম্পানির মজুর, মদ খেয়ে অসাড় হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে কখন ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহে লোকটার গায়ের উপর ঢলে ঘুমিয়ে পড়লাম।

জেগে উঠলাম কথাবার্তার আওয়াজে। চোখ মেলে দেখি ভোর হয়ে গেছে। ঘাড়ে ভীষণ ব্যথা। মাথা গুঁজে বসে কাটিয়েছি। দেখি দূরে কয়েকজন আদিবাসী, হাতে তীরধনুক, জটলা পাকাচ্ছে। আমাকে দেখিয়ে কি জানি বলা-বলি করছে। দেখলাম তাদের মধ্যে দুজন স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙছি এমন সময় তারা স্টেশন মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। দেখি তাদের সঙ্গে একটি দড়ির খাটিয়া।

স্টেশন মাস্টার বলল, "মশাই করেছেন কি? সারারাত এই মরা মানুষের পাশে কাটিয়েছেন? এরা এসেছে লাশ নিয়ে যেতে!"

বলেন কি! আমি একটা মৃতদেহের গায়ে ঠেস্ দিয়ে নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেছি!

স্টেশন মাস্টার বুদ্ধি দিল, "দেখুন মশাই, ট্রেন আসবে কিনা সন্দেহ। এক কাজ করতে পারেন। হাঁটাপথে চলে যান। এদের মধ্যে দুজন লোককে সঙ্গে দিচ্ছি। পাঁচ-পাঁচ দশ টাকা পারিশ্রমিক দিলে আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সোজা রেলপথ ধরে যাওয়া যেতে পারতো কিন্তু ওদিকটা আপ গ্রেড, কতকগুলো কাটিং আছে আর তার মধ্যে দু-জায়গায় বাঘের ভয়। এরা গ্রামের জানা পথ-গুলো দিয়ে ঘুরে যাবে—অবশ্য দূর আছে—"

বুঝলাম আপদ তাড়াতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

আমারও আর সেখানে থাকার ইচ্ছে নেই। কাজেই রাজী হয়ে গেলাম।

আমার সঙ্গী দুজন জাতিতে কোল। একজন একটু একটু হিন্দী জানে। টাঙ্গি আর তীরধনুক হাতে আমার পথপ্রদর্শক হয়ে চলল।

॥ ৩ ॥

আদিম অরণ্যপথ। টাঙ্গি দিয়ে মাঝে মাঝে ঝোপ কেটে পথ করে এগিয়ে চলতে হচ্ছে। কখনও উঁচু পাহাড়ে উঠছি। কখনও ঢালু উপত্যকায় নামছি। মধ্যে মধ্যে এক-একটি ক্ষীণকায়া খরস্রোতা পাহাড়ী নদী অতিক্রম করে চলছি। জলে নামতে হচ্ছে। পথে কোথাও মানুষখেকো বাঘের ভয়। আমার পথ-প্রদর্শকরা সেসব এলাকা সাবধানে এড়িয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে চললো।

যেতে যেতে প্রচুর হরিণ দেখলাম। দল বেঁধে নিঃশঙ্ক চিত্তে চরে বেড়াচ্ছে। গাছের ডালে ও মাটির ওপর অজস্র ময়ূর। তাদের কি বিচিত্র বর্ণের পাখা! কোলেরা আমাকে বাঘও দেখালো। চলতে চলতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বনের একদিকটা দেখালো, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি একটা বাঘও দেখতে পেলাম না। অরণ্যচারী কোলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি আমি পাব কোথায়?

উলিবুরু ক্যাম্পে পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল।

আমাদের দেখে একজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোক তাঁবুর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলেন। পরনে খাকি শার্ট, হাফপ্যাণ্ট। মাথার সামনে অল্প টাক। পিছন দিকে ও কানের পাশে লম্বা চুল।

ইংরেজীতে প্রশ্ন হল—"কে ?"

নিজের পরিচয় দিলাম।

ভদ্রলোক এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করলেন। তাঁর পরিচয় জানলাম—ক্যাম্পের ম্যানেজার, নাম বি. সি. এ. এ্যালেন।

"আপনার আসবার কথা আমি আজই ডাক-রানার মারফৎ পেয়েছি। মিঃ স্টার্ক জগন্নাথপুরে তার করেছিলেন। কিন্তু এলেন কি করে ? ট্রেন চলাচল তো বন্ধ !"

বললাম, "হাঁটাপথে, এরা পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।"

ম্যানেজার বললেন, "বাঃ ইয়ংম্যান, তোমার বাহাদুরি আছে ! তবে বড্ড হঠকারিতা হয়ে গেছে। পথে কয়েকটা ম্যান-ইটার বাঘ উপদ্রব আরম্ভ করেছে। তোমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে।"

ম্যানেজার আমার পথ-প্রদর্শকদের কোল ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তারা আমায় কোন্ পথে নিয়ে এসেছে। তারপর আমাকে নিজের অফিস-তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে বললেন, "খুব ক্লান্ত হয়েছ, আগে এক পেয়ালা চা খেয়ে নাও।"

তাঁবুর মধ্যে চেয়ারে বসে তাঁর মুখের দিকে ভাল করে তাকাতেই তিনি বললেন, "কি ভাবছো আমায়—জিপ্সী ? কি করব ? এখান থেকে নিকটতম নরসুন্দরের বাস হচ্ছে চাইবাসায়। ঘোড়ায় চড়ে ৬৪ মাইল রাস্তা। কাজেই চুল কাটা বড় একটা হয়ে ওঠে না।"

চা খাওয়া শেষ হলে ম্যানেজার বললেন, "দেখো, তোমার এখানে থাকতে কোন অসুবিধা হবে না। একজন ভাল ব্র্যাম্হিন-এর সঙ্গে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

এই বলে ডাকলেন, "বোস, বোস !"

পাশের অফিস-তাঁবুতে একজন যুবক টাইপ করছিল। কাজ ফেলে বেরিয়ে এল।

ম্যানেজার বললেন, "ইনি হচ্ছেন এ. সি. বোস। আমার স্টেনোগ্রাফার। অতি উত্তম ব্র্যাম্হিন্। বোস একে টেণ্টে নিয়ে যাও। তোমার সঙ্গে থাকবেন।"

বোস একটু মুচকি হেসে বলল, "চলুন।"

ম্যানেজার আমাকে ব্রাহ্মণ-সঙ্গী দেবার জন্য কেন এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সে কথা পরে জেনেছিলাম। হেড ক্লার্ক পি এল ব্যানার্জি আর সুপারভাইজার হালদার নাকি কিছুদিন আগে একই অজুহাত দেখিয়ে ভেগে পড়ে—"ব্রাহ্মণসন্তান স্যার, এই পাঁচমিশালী জাতের ছোঁয়াছুঁয়ি এঁটোকাঁটার মধ্যে থাকা আমাদের পোষাবে না। চাকরি করতে এসে কি জাত খোয়াবো ?"

তাই ব্রাহ্মণের জাত না মারা যায় এ বিষয়ে ম্যানেজার এবার খুব সজাগ।

কাছেই ঘন বনের মধ্যিখানে বোসের ক্যাম্প। পায়ে-চলা সরু পথ দিয়ে-এঁকে বেঁকে যেতে হয়। আমার লোক দুজন দেখলাম ইতিমধ্যে একটা মশাল তৈরি করে জ্বালিয়ে নিয়েছে। ততক্ষণে জঙ্গলের ভেতরটা ঘোর অন্ধকার।

বোস যেতে যেতে বললে, "আমাদের ক্যাম্পটা ঠিক তাঁবু নয়। আপনার কষ্ট হবে। দুটো বুনো হাতি মারামারি করতে করতে টেন্টের ওপর এসে পড়ে। ভাগ্যিস তখন আমরা কেউ ভিতরে ছিলাম না। তাঁবুর কাপড় আর সব জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে যায়। আমরা তাড়াহুড়ো করে একটা বড় গাছের নিচু দিকে কয়েকটা ডালের ওপর তাঁবুর ছেঁড়া কাপড়টা বিছিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়েছি—দুটো মাচার মধ্যে একটাতে আমাদের দুজনকে ভাগাভাগি করে থাকতে হবে—"

বোসের কথা শেষ হবার আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম।

ক্যাম্প দেখে তো আমার চক্ষুস্থির। দেখি গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি একটা ঘর। মাঝখানে মানুষ যাতায়াতের ফাঁক। দুদিকে দুটো বিছানা, মেঝে থেকে প্রায় চার হাত উঁচুতে। একটির উপর একজন লোককে দেখলাম গুরুতর অসুস্থ হয়ে প্রলাপ বকছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ। শীর্ণ। কোটরগত চক্ষু। পাশে বসে একজন ফরসা সৌম্য চেহারা টাকমাথা লোক শুশ্রূষা করছে।

বোস পথে আসবার সময় নিজের পরিচয় দিয়েছিল অনুকূল চন্দ্র বসু, মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া গণ্ডগ্রামে বাড়ি। এবার আমাকে অন্য মাচাটি দেখিয়ে বলল, "বেড়ার কাছের দিকটা কিন্তু আমার। আপনার এ পাশটা অর্থাৎ অসুস্থ লোকটির দিকে। বোস দেখলাম বেশ শৌখিন লোক। বিছানার পাশে বেড়ার লম্বা ডালের উপর সাজানো রয়েছে আয়না, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, কয়েকটা ছবি, সুগন্ধী তেলের শিশি ইত্যাদি। নানান টুকিটাকি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সাজিয়ে গুছিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছে।

সে বাকি কাজ সেরে আসতে ফিরে গেল।

সারাদিন হেঁটে পায়ের অবস্থা কাহিল। তলাটা জ্বালা করছিল। আঙুলগুলো টাটিয়ে গিয়েছিলো। ট্রাঙ্কের ভেতর চটিজোড়া আছে। খুলতে গেলে কোথাও বসতে হয়। দেখলাম মাচার তলায় একটা কাঠের বাক্স রাখা। উপরে নাম লেখা 'আবু ইউসুফ B. Sc. (Hons) জিওলজিস্ট'। ভাবলাম দাড়িওয়ালা অসুস্থ লোকটি বোধ হয় আবু ইউসুফ। বাক্সটা টেনে নিয়ে বসামাত্র সেই সৌম্য প্রকৃতির লোকটি আমায় ইংরাজীতে প্রশ্ন করলেন, "তোমার বাবা-মা কেউ নেই?"

"না, নেই। কেন?"

"বুঝেছি। নইলে এমন জায়গায় কি কেউ আসে?"

ছাড়া মোজাজোড়া বিছানার ভেতর গুঁজে রেখে পায়ের ফোসকার উপর হাত বুলোতে বুলোতে কাপড়মোড়া জলের বোতলের দিকে লুব্ধভাবে তাকিয়ে আছি দেখে সেই ব্যক্তিটি আবার বলল, "ছিপি খুলে খেয়ে নাও খানিকটা, ঠাণ্ডা আছে—এখানে চক্ষুলজ্জা করতে গেছ কি মরেছ! দেখ বাপু, আর একটা কথা বলে রাখি, এই লোকটির শেষ সময় উপস্থিত। আমিও চলে যাচ্ছি। ম্যানেজার একটি বদ্ধ পাগল। তুমি ও বোস, দুই ছোকরা মিলে এখন ঠেলা সামলাও—"

বোস ফিরে আসতে জানতে পারলাম যে এই স্পষ্টবক্তা লোকটি হচ্ছে আবু ইউসুফ। প্রায় ৭২ ঘণ্টা নিদারুণ কষ্টভোগ করার পর অসুস্থ যুবকটির জীবনদীপ নিবে গেল। সুদূর ঢাকা থেকে এসেছিল কেমিস্ট-এর চাকরি নিয়ে। উড়িষ্যার অরণ্যে আত্মীয়স্বজনহীন অবস্থায়—বেচারা ম্যালিগনেণ্ট ম্যালেরিয়ায় বিনা চিকিৎসায় বেঘোরে প্রাণ দিল।

আমরা কজন মিলে প্রাণশূন্য তরুণ দেহ দাহ করলাম নালার ধারে।

কদিন পরে আবু ইউসুফ সার্ভেয়ার কেশবাবুকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

যাবার আগে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললে, "ঘোষ, তোমাকে একটা দায়িত্ব দেব। দেখছো তো এরা সবাই লোক ভাল, কিন্তু আত্মনির্ভরতার অভাব। তোমাকে ডাক্তারি করতে হবে। আজ থেকে এরা তোমার মুখ চেয়ে থাকবে—"

"এ্যাঁ!"

"হ্যাঁ, এই ওষুধের বাক্সটা তোমার জিম্মায় রেখে যাচ্ছি—এই নাও।"

কালো বনাত-মোড়া একটা ছোট চৌকো কাঠের বাক্স তিনি আমার হাতে

ধরিয়ে দিলেন। ভেতরে ক্ষুদে ক্ষুদে শিশি। তাতে ভর্তি বড়ি, জল।

"এসব কি ?"

"হোমিওপ্যাথিক ওষুধ। তোমার হাতিয়ার।"

একটা প্রবল প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলাম—"সে কি! আমি ডাক্তারি করবো ? ওসব কক্ষনো করিনি। বড় জোর জ্বর হলে মাথায় জলপটি দিয়ে হাওয়া করেছি—তাছাড়া ঐটুকু-টুকু বড়িতে আবার রোগ সারে নাকি! আমি পারবো না—"

আমায় থামিয়ে দিয়ে ইউসুফ বললে, "পারবে, খুব পারবে। আমিই বা কোন্ পাস-করা ডাক্তার ? এতদিন তো এই বড়ি দিয়েই চিকিৎসা করে এসেছি। আমি যদি পেরে থাকি, তুমিও পারবে। লক্ষ্য করেছি তোমার দয়ামায়া আছে। দায়িত্ব নিতে পার। ডাক্তারের ঐটাই সব চেয়ে বড় গুণ।"

আমাকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে ইউসুফ এখানে প্রধানতঃ কি কি রোগ হয় এবং কোন্ রোগে কি ওষুধ ব্যবহার করতে হবে সে সম্বন্ধে মিনিট কুড়ির এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বোসকে লিখে নিতে বললে। পরে সে টাইপ করে আমাকে দেবে।

বোস চলে গেলে সে গলার স্বর নামিয়ে বললে, "সব সময় সব রোগে যে ওষুধে কাজ হবে তার কোন ঠিক নেই তবে আসল কথাটা হচ্ছে চিকিৎসার চেষ্টা। অসুস্থ লোকগুলো তাইতেই মনে জোর পাবে—সেটুকুই বা কম কি!"

অতঃপর আমাকে সেই পাঁচ-ছয়শ' লোকের অনারারি মেডিক্যাল অফিসার বানিয়ে দিয়ে ইউসুফ প্রস্থান করলো।

॥ ৪ ॥

সদ্য পরলোকগত ও পদত্যাগকারী দুজনের পরিত্যক্ত মাচাখানি আমার দখলে এসে যেতে হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচলাম। বোস তার নিজের বিছানাটিকে পরিপাটি করে গুছিয়ে নিল। ম্যানেজার সাহেবের কোন এক খোশমেজাজের মুহূর্তে সে নাকি প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল যে এ তাঁবুটা কেবলমাত্র আমাদের দুজনের। যারা গেছে তাদের জায়গায় নতুন লোক এলে ভিন্ন তাঁবুর ব্যবস্থা হবে।

আশ্চর্য মানুষ এই বোস। গ্রাম থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে কয়েক মাস মাত্র শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং শিখে এই শ্বাপদসঙ্কুল গহন বনে এসে জুটেছে। অথচ বন্দুক ছুঁড়তে জানে না। স্পর্শ করতেও নারাজ। কিন্তু কেউ কিছু শিকার করে এনে দিলে ছাল-পালক ছাড়িয়ে রান্না করতে ওস্তাদ। সদাই প্রফুল্লবদন। সহকর্মীদের অসুখ-বিসুখে, সেবা-শুশ্রূষার কাজে সে ছিল ইউসুফের মতই অগ্রণী। তবে আমি যাবার পর থেকে সকল ব্যাপারে আমার উপরে এমন নির্ভরশীল হয়ে পড়লো যে অনেক সময়ে বেশ বিরক্ত হয়েছি। রূঢ় আচরণ করে বসেছি।

আমরা ছিলাম সমবয়স্ক। দুজনেই বয়সে তরুণ।

ঘনবদ্ধ গাছপালার অন্তরালে ছোট ছোট তাঁবুতে ইতস্তত: ছড়িয়েছিল সার্ভেয়ার, ওভারসিয়ার, সুপারভাইজার ও কেরানীরা। দু-একজন ঠিকাদারও পাহাড়ের ঢালুর ওপর বাসা বেঁধেছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করতো। সাক্ষাৎ হতো রাত্রে খাওয়ার সময়। আমাদের ক্যানভাস-ছাওয়া পর্ণকুটিরের কাছেই ছিল যৌথ রন্ধনশালা ও খাবার ঘর। শালগাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি—গোবর ও মাটির প্রলেপে বেশ পরিচ্ছন্ন।

শুনেছিলাম ঠিকাদার মঙ্গল সিং কয়েকটি গরুর গাড়ি এনেছিল কোম্পানির মালবহনের কাজে, কিন্তু বাঘের উপদ্রবে তার উদ্যম পরিত্যক্ত হয়। গোময় বোধ করি তারই দান।

আমার কাছে সকল কিছুই মনে হতো বিচিত্র বিস্ময়কর।

তখনও গ্রীষ্মের সন্তাপ শুরু হতে বিলম্ব ছিল, কিন্তু প্রকৃতি উগ্র রূপ ধরেছে। প্রখর বাতাসে গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়ে উড়ে বেড়ায়। কোকিলের মত্ত ডাক, ঘুঘুর কণ্ঠনিঃসৃত সানন্দ মধুর ধ্বনি, নানাবর্ণের ছোট পাখির কাকলি, মহুয়ার মদির গন্ধ, পলাশের রক্তরাগ, দূরাগত হরিণ ও ময়ূরের আহ্বান ও উত্তর, চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত বৃক্ষচূড়া হতে 'চোখ-গেলো' 'চোখ-গেলো' অথবা 'বউ-কথা-কও' অথবা 'ব্রেনফিভার' 'ব্রেনফিভার' মুহুর্মুহুঃ নিদ্রাহারা পাখির ডাক—সব জড়িয়ে আমাদের তরুণ মনকে উদ্বেল করে তোলে।

বনমোরগের ডাকে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে মাচা থেকে নামতাম। তারপর যেতাম আমলকী, হরিতকী ও বহেড়া গাছের নিচে লতাগুল্মে ঘেরা নিভৃত জায়গায় প্রাতঃক্রিয়া সারতে। ডাল ভেঙে দাঁতন করে হাতমুখ ধুয়ে গরম গরম চা-বিস্কুট-যোগে জলখাবার খেয়ে ছুটতাম কাজে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখতাম হরিণ ও ময়ূরের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। ওরা জানে মানুষের কাজের সময়

ওদের কোনো ভয় নেই। অফিস-তাঁবুতে অথবা খাদানে খাদানে সকলেই কাজে ব্যস্ত। সময় কাটতো হু-হু করে। মধ্যে একবার ফিরে এসে গোগ্রাসে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে আবার ফিরে যেতাম সংকীর্ণ বন্ধুর পথ দিয়ে।

দেখতে দেখতে পশ্চিমের পর্বতপুঞ্জের পিছনে সূর্য ঢলে পড়ত। সেখান থেকে উলিবুরু পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত নদীনালা ও ঘনবদ্ধ জঙ্গল বেয়ে উঠতো ছায়াচ্ছন্ন আঁধার।

তখন সবার ঘরে ফেরবার পালা। খাদান থেকে বেরিয়ে আসতো মজুরের দল, টাইমকীপার, ওভারসিয়ার ও ঠিকাদারেরা। অন্ধকার জমাট বাঁধার আগেই আমরা যে-যার তাঁবুতে ফিরতাম। অল্প কিছুক্ষণ পরে চারদিক নিঝুম হয়ে যেত। বিকেলের উত্তাল বাতাস যেত থেমে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। অবিশ্রান্ত মর্মরধ্বনিও নীরব। আকাশে বাতাসে সেই আদিম প্রকৃতিরাজ্যে কি এক রহস্যময় থমথমে ভাব। যেন অলৌকিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

আমরা কটি মানুষ এই সময়টিতে নিজেদের বড় অসহায় বোধ করতাম। এই ভাবটা কাটিয়ে উঠতে আমরা নিজেদের মধ্যে সরবে নিরর্থক আলাপ-আলোচনা জমাবার চেষ্টা করতাম। রান্নার আয়োজন করতাম মহোৎসবে। হারিকেন ও পেট্রোম্যাক্স বাতিগুলিকে মেজেঘষে পরম যত্নে পরিষ্কার করতে লেগে যেতাম।

একটু পরেই কিন্তু অরণ্য উঠতো জেগে। মুখর হয়ে উঠতো তার ভাষা। আরম্ভ হতো ঝিঁঝির ঐক্যতান। শোনা যেত ময়ূরের মুহুর্মুহুঃ কর্কশ ডাক। নানা ধরনের পোকা সজোরে উড়ে এসে ঠিকরে পড়তো আমাদের গায়ে, উজ্জ্বল বাতির কাচে। জঙ্গলের ভিতরে হরিণের আহ্বানে হরিণী দিত সাড়া।

কান পেতে শুনতাম আচমকা আরও অনেক রকম শব্দ। বোস বলতো, "এটা একটা প্যাঁচা। প্রথম প্রথম বিকট আওয়াজ শুনে চমকে উঠেছি, এখন গা-সহা হয়ে গেছে।"

"মড়াকান্না! ও শব্দ মানুষের নয়—ভাল্লুক চেঁচাচ্ছে। এই বেয়াড়া ডাক যা শুনছেন, ওটা হায়না কিংবা বুনো কুকুরের ডাক।"

শম্বর, বাঘ ইত্যাদি সব জানোয়ারের শব্দ ইউসুফ তাকে শিখিয়েছে।

সুপারভাইজার জয়গোপাল বক্সীর তাঁবু থেকে শোনা যেত গলা ছেড়ে যাত্রার পালা। কোন দিন তিনি জয়সিংহ, কোন দিন তিনি সংযুক্তা। মউল আরকের মাত্রা কিছু বেশী হলে আমাদের কাছে চলে আসতেন সমঝদার শ্রোতার খোঁজে।

কোন তাঁবু থেকে ভেসে আসতো উদাত্তকণ্ঠে কালীকীর্তন। কোন তাঁবুতে

তাদের আড্ডা জমতো।

কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী বদল হতো কেমিস্ট। কলেজে পড়া ছেলেগুলো কেন জানি না কিছুতেই জঙ্গলী জীবনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারতো না। এই সময় একজন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ প্রধান রাসায়নিক এসে টিকে গেলেন। কলকাতায় থিয়েটার দেখা অভ্যাস ছিল তাঁর। মাঝে মাঝে বেসুরো মুক্তকণ্ঠে গান ধরতেন নিজের কিংবা ঠিকাদারের তাঁবুতে,

"মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে
প্রিয়তম তুমি আসিবে"

নেশা করলে আমাদের দিকে ঘেঁষতেন না বড় একটা, কিন্তু একদিন বক্সী জোর করে ধরে এনে ওঁর লজ্জা ভাঙিয়ে দেয়। কতকগুলো হাসির গান গাইয়ে ছাড়ে। কথাগুলো স্মরণ নেই কিন্তু ওরা চলে গেলে বোসের কাছে একটা কথার মানে জানতে চাইলে ওর কান দুটো লাল হয়ে ওঠে, উত্তর দেয় না, গুম হয়ে থাকে। একটা লাইন মনে আছে—"ওগো তোমরা সবাই বলে দাও ভাতার কেমন মিষ্টি—"

এই সব পাঁচমিশালী কোলাহল কিন্তু থেমে যেত নিঃসঙ্গ ম্যানেজার যখন কয়েক পেগ সুরাপানের পর তাঁর প্রিয় বেহালাটি কোলে তুলে নিতেন।

কি অপূর্ব হাত! চোখে দেখতে পেতাম না, কারণ রাত্রে তাঁর তাঁবুর ধারে-কাছে যাওয়া নিষেধ ছিল আমাদের। কিন্তু সেই নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ভেদ করে ভেসে আসতো এক অনির্বচনীয় সঙ্গীতধারা। আমাদের মধ্যে যারা পাশ্চাত্ত্য সুরে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল তারাও সেই করুণ বিষণ্ণ সুরের মূর্ছনায় সমাহিত হয়ে পড়তো। মনে হতো কেবল আমরা কজন মানুষই নয়, সেই আদিম অরণ্যরাজ্যে গাছপালা, পশুপাখি সবাই যেন আবিষ্ট হয়ে শুনছে।

হঠাৎ সুর কেটে গেলে, সুরারসিক বক্সীমশাই আমাদের তাঁবুতে উপস্থিত থাকলে উঠে দাঁড়িয়ে বলতো, "এই রে, এবার ব্র্যাণ্ডির মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে!"

॥ ৫ ॥

পূর্ব-আফ্রিকায় থাকতে চলন্ত রেলগাড়ি থেকে দেখেছি পাহাড়ে আগুন লাগা। আগুন পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়তো। দূর থেকে সে অপূর্ব দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। কেওঞ্জর-সিংভূমের গহন বনে প্রথম দাবানল দেখলাম তরুণ কেমিস্ট সেনগুপ্তের মৃতদেহ দাহ করে ফেরার পথে। এ দৃশ্যের ভয়াল সৌন্দর্য আরও অনেক নিবিড়, অনেক অন্তরঙ্গ। মনে হয় যেন একেবারে অঙ্গাঙ্গী। সানন্দ-বিস্ময়ে বসে গেলাম এক শিলাখণ্ডের উপর। দেখলাম পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণের অসংখ্য পর্বতমালার খাঁজে খাঁজে, শিখরে শিখরে অতি উজ্জ্বল রত্নময় হারের ছড়াছড়ি। মধ্যে মধ্যে এক-একটি অতিকায় গাছ প্রজ্বলিত হয়ে দেখাচ্ছে অলৌকিক মধ্যমণির মতো। অকস্মাৎ দেখতে পেলাম পাশের বিলকুণ্ডি পাহাড়েও আগুন লেগেছে। ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে উত্তাপ অনুভব করলাম। শুনতে পেলাম শুকনো ঝোপঝাড় জ্বলার ফট্ ফট্ আওয়াজ। আগুনের পরিধি দ্রুত বেড়ে গিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

সার্ভেয়ার কেশবাবুর ডাকে চমক ভাঙলো—"ইউসুফ সাহেব ডাকছেন!" তিনি সাবধান করে দিলেন, আগুনের তাড়নায় বড় জানোয়ারগুলো এদিকে চলে আসতে পারে।

গত দু-রাত্রে ক্যাম্প থেকে বার হইনি বলে এ দৃশ্য দেখা হয়নি। শুনলাম সারা বসন্তকাল এমনি ভাবে আগুন ছড়াতে থাকে। প্রকৃতিরাজ্যে এই দেওয়ালী উৎসব ভাষার বর্ণনায় বোঝানো যায় না।

কেশবাবুর কাছে শুনলাম তাঁর চেনম্যানদের মধ্যে একজনকে আমি যেদিন আসি সেদিন বাঘে তুলে নিয়ে যায়। এই দাবাগ্নির জন্যে শিকারের চিরাচরিত ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটেছে বলেই নাকি বাঘেরা মানুষ ধরছে। এবার নিয়ে নাকি একমাসের মধ্যে তিনজন লোককে তিনি এইভাবে হারিয়েছেন। বাঘে নাকি বাছাই করে মোটা লোকগুলোকে তুলে নেয়। আমি বিশ্বাস করছি না দেখে বোস বললে, "জানেন আগের সার্ভেয়ার ফুলচাঁদবাবুও কিন্তু এই কথাই বলতেন। এই নিয়ে সাহেবের সঙ্গে তর্ক করে তিনি কাজই ছেড়ে চলে যান।"

আমরা সব চেয়ে ভয় করতাম হাতিকে। ঠাকুরাণী পাহাড়তলির বাঁশবন, আর সেখান থেকে ভদ্রাসাই পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মোটা মোটা গাছের ছাল ছিল

ওদের প্রিয় খাদ্য। সেগুলোকে আগুনে ঘিরে ফেললে ওরা কোথায় কোথায় যে ছড়িয়ে পড়বে তার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। হাতির দল হুলকি গ্রামের ক্ষেতখামার ধ্বংস করে জল খেতে আসতো আমাদের নালায়। ইউসুফ বোসকে অনেকবার দেখিয়েছে এই উলিবুরু পাহাড়ের ঢালুর ওপর তাদের যাতায়াতের চিহ্ন—গাছের গায়ে গায়ে ক্ষতচিহ্ন আর ফুটবল আকারের ধূমায়মান মলের রাশি।

বাইসনের গতিবিধি ছিল নালা পর্যন্ত। আমাদের পাহাড়ে উঠে আসতো না বড় একটা, কিন্তু একদিন গভীর রাত্রে বাঘের সঙ্গে এমন জোর লড়াই বেধে গেলো যে মনে হলো ক্যাম্পের ওপর এসে পড়ে আর কি!

বোস বলল, "বাঘের চেয়ে বেশী ভয় ভাল্লুকের। যখন এই গাছের তলায় আশ্রয় নিই তখন ভাবিনি যে একদিন মহুয়া ফুলের গন্ধে যত রাজ্যের ভাল্লুক এসে জুটবে। রাত্রে আলো না সঙ্গে নিয়ে এক পা-ও যাওয়া নিরাপদ নয়—"

কথা কণ্ঠলগ্ন হয়ে গেলো। শুনতে পেলাম ধ্যাক্ ধ্যাক্ থক্—সঙ্গে সঙ্গে বড় কোন পশুর ছোটার শব্দ।—বোস বলল, "সম্বর ভয়ে পালাচ্ছে—নিশ্চয় বাঘ।"

পরের দিন জে. এস. খাদানের ধারে রক্তের ছড়াছড়ি দেখে ঠিকাদার তেজবাহাদুরের মুনশী এসে খবর দেয়—"সাহাব, ইত্না খুন লড়াই মে ভি নেহি দেখা—"

লোকটি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পল্টনে কাজ করতো। গল্প করবার ছুতো পেলে সহজে উঠতে চাইত না। আমিই উঠে পড়ে বললাম, "চল দেখিগে যাই—"

অশিক্ষিত চোখে বাঘ কিংবা অন্য কোন পশুর পায়ের দাগ দেখা গেলো না। কঠিন পাথরের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে রক্তের ধারা। এদিকে কাজ হচ্ছিল বলে কিছুটা ফাঁকা। আরও কিছু নিচে ঝোপঝাড়, নালা—এগুতে সাহস হলো না।

বোস না কেশবাবু, ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, সতর্ক করে দিয়েছিল যেন কোথাও মানুষের বাচ্চার কান্না শুনে কৌতূহলী হয়ে দেখতে না যাই—ও হচ্ছে ভাল্লুক-বাচ্চা, ককিয়ে কেঁদে মাকে উত্ত্যক্ত করে।

যেখানেই যাই এই সব অদ্ভুত শব্দ শোনবার জন্যে কান সজাগ থাকতো।

হুক্-হুক্-হুক্, পিউ-পিউ-উ, ক্রু ক্রু ট্রু ট্রু, পিক্ পুউ, পুক্ পুউ-উ—কত পাখি যে ডেকে যায়। বেলা বাড়লে রৌদ্র চড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুনি পিট্রুউউ, পিট্রুউউ। ধ্বনির উচ্চতা দিয়ে কণ্ঠনালীর আয়তন অনুমান করতে গিয়ে ঠকেছি। ছোট্ট পাখি মুঠার মধ্যে ধরা যায় কিন্তু কি বাজখাঁই তার গলা। বিস্ময়ের শেষ নেই।

ডায়েরির এক জায়গায় লেখা দেখছি—Some long-throated metallic roll of 'r'—কেমন করে বাংলায় বোঝাবো জানি না। কি পাখি বোস বলতে পারলো না।

॥ ৬ ॥

আমাদের জীবনযাত্রা ছিল বিচিত্র। কোন ঠাকুর নেই চাকর নেই। কে মরতে আসবে এই জঙ্গলে? সার্ভেয়ার কেশবাবু ছিলেন উড়িষ্যাবাসী। একবার তিনি লক্ষ্মণ নামে এক পাচককে গড়ের কাছাকাছি কোন গ্রাম থেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনেন। কিন্তু দুদিন না যেতে-যেতেই সে পালিয়ে বাঁচে।

ক্যাম্পের যাবতীয় কাজ আমরা নিজেরাই পালা করে করতাম। চাল ও আলু যোগাড় হতো জামদার হাট থেকে। হাট বসতো সপ্তাহে একদিন, বুধবারে। সেদিন কোম্পানির কাজ বন্ধ থাকতো, কিন্তু প্রতি হাটে যাওয়া হয়ে উঠতো না, কারণ সেই একদিনই শম্বর ও বরাহ শিকারে যেতে হতো। ঝুলিয়ে নিয়ে এসে ছাল ছাড়ানো, কাটা ও রান্না করা ছিল সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

অবশ্য হাটে চাল ও আলু ছাড়া বিশেষ কিছুই পাওয়া যেত না।

প্রতিদিন একই পদ—ভাত, আলু ও মাংস। কাজের দিনে পাখির মাংস সহজেই জুটে যেত। বনমোরগগুলো শেষ পর্যন্ত বড় চালাক হয়ে গিছলো। কিন্তু ময়ূররা ছিল বোকাসোকা, পাওয়াও যেত অজস্র।

একঘেয়ে মাংস চিবুতে চিবুতে বঙ্গ ও উড়িয়া সন্তানদের মনে পড়তো মাছের কথা। আমি অবশ্য মাছের মোটেই ভক্ত ছিলাম না। কিন্তু কয়েকটি মৎস্য-প্রেমিক প্রতিদিন খাওয়ার সময় টেনে আনতেন মাছের প্রসঙ্গ।

একদিন নিছক বাহাদুরির ঝোঁকে বলে বসলাম, "এ আর এমন কি কথা—আমি খাওয়াতে পারি—"

বোস বললে, "কেন মিছিমিছি আশা দিচ্ছেন—"

বক্সী কথায় কথায় বাজি ধরতো। বলে বসলো, "বেশ বাজি! এক সপ্তাহের মধ্যে মাছ খাওয়াতে পারলে আমরা প্রত্যেকে দু টাকা করে দেবো। আর না খাওয়াতে পারলে আপনাকে দিতে হবে কুড়ি টাকা 'কমন ফাণ্ডে'।"

সুকেশ ব্যানার্জি বক্সীর পিছনে লাগার সুযোগ পেলে ছাড়ে না। বললে,

"ছাণ্ডিয়া ফাণ্ডে বল!"

থামিয়ে দিয়ে আমি তাকে বললাম, "এক সপ্তাহ কেন, পরশুই খাওয়াবো।"

সুধীর চ্যাটার্জি স্বল্পভাষী লোক। বললে, "মাছ খাই বা না-খাই খাবার আশা পেয়েছি, তাই বা কম কি? ঐটুকুর মূল্য হিসেবে তো আমাদের এক টাকা করে চাঁদা দিতে হয়—রসনায় জল এসে গেছে।"

বোস ভাবলো রসনা কথাটা অশ্লীল। আমার মর্যাদা বুঝি হানি হচ্ছে, তাই প্রসঙ্গটাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করলো সে। বলল, "বুঝছেন না, ঠাট্টা করছেন উনি। এখানে নদী, পুকুর কোথায়? নালাগুলোতেও মাছ নেই।"

আমি কিন্তু বলে উঠলাম, "তাহলে বক্সী মশায়ের বাজিটাই পাকা রইলো। আমি হারলে বৃহস্পতিবার সকালেই কুড়ি টাকা জমা দেবো ঠিকাদার জাগমল দোসার হাতে। সে সাকচি থেকে মিষ্টি আনিয়ে দেবে।"

মিষ্টান্ন ভোজনের সম্ভাবনায় সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আমি যে বাজি হারছি এ বিষয়ে তারা স্থিরনিশ্চিত।

ঘরে ফিরে বোস বললে, "খামকা কুড়ি টাকা খরচ করলে আপনার চলবে কি করে? যে টাকা আগাম নিয়ে এসেছেন তার অর্ধেক তো সামনের মাসের মাইনে থেকে কাটা যাবে—তার ওপর আবার কুড়ি—"

ইঙ্গিতে ওকে থামিয়ে দিলাম। ম্যানেজার সাহেবের বেহালার সুর এল ভেসে।

অদ্ভুত এই মানুষটি। এদেশে প্রথম আসে লর্ড কেব্‌ল-এর পরিকল্পিত ইস্পাত কারখানার জরিপের কাজে। ১৯২০ সালের কথা। বর্তমান রূঢ়কেলার কাছাকাছি বিসরা অঞ্চলে ক্যামেলস্টেয়ার্ড ও বার্ড কোম্পানি দশ লক্ষ টাকা খরচ করে কারখানা ও শহরগুলির যে নক্সা তৈরী করে তার ভার পড়েছিল এই এ্যালেন সাহেব-এর উপরে। সেই সূত্রে নানারকম কাঁচা মালের ইজারা নেওয়ার সময় জরিপের কাজে তাকে পাঠানো হয় জামদা অঞ্চলে।

তারপর পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যক্ষেত্রে মন্দা দেখা দেয়। ইস্পাত কারখানার পরিকল্পনা মুলতবী থাকে। চেষ্টা চলে ইজারা নেওয়া আকরগুলি থেকে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি করে কিছু টাকা তোলার। এ্যালেনকে তখন সেই কাজে ম্যানেজার পদে বহাল করা হয়।

এই রহস্যময় লোকটির ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় কেউ ভাল করে জানতো না। কেন যে সে সুদূর বিদেশে এই দুর্গম পশুসঙ্কুল অরণ্যে আত্মগোপন করে

আছে, কেন যে সে অন্য শ্বেতাঙ্গ লোকেদের সংস্রব এড়িয়ে চলে—এই সব প্রশ্নের উত্তর হয়ত কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদেরও জানা ছিল না। শুধু এটুকু তাঁরা বুঝেছিলেন—এইরকম একরোখা সৃষ্টিছাড়া লোক না হলে এখানকার ধকল সামলানো অন্য কারো কর্ম নয়।

ম্যানেজারের খাস তাঁবুর মধ্যে আমাদের প্রবেশ নিষেধ বলেই ভিতরটা দেখার কৌতূহল পেয়ে বসলো। একদিন সাহেব ঘোড়ায় চেপে সারাদিনের মত কোম্পানির পঁয়তাল্লিশ বর্গমাইল এলাকা পরিদর্শনে বার হতেই আমি বোসকে পাঠিয়ে দিলাম সাহেবের খিদমৎগার টিমাকে ভুলিয়ে রাখতে। তারপর নিজে ঢুকলাম তাঁবুতে। দেখি ক্যাম্প-কটের পাতলা বিছানার উপর বেহালাটি রাখা। চারপাশে একটি ঘোরানো টেবিল। তার উপর বন্দুক, রাইফেল, পিস্তল, হরেক রকমের কার্তুজ, তীরধনুক, টাকাপয়সা আর কয়েকটা পুরনো বিলিতী সচিত্র মাসিকপত্র ছড়ানো রয়েছে। পাশে একটা র‍্যাকে কয়েকটা বই, তার নিচে একটা টিনের বাক্স। এ ছাড়া একগোছা খাকি প্যান্ট-শার্ট, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম এবং কয়েক জোড়া জুতো-মোজা ছাড়া রহস্যজনক কিছু চোখে পড়লো না।

আমাদের মত দরদী শ্রোতা পেয়ে টিমা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার এই অদ্ভুত সাহেব সম্বন্ধে অনেক কথা বলতো।

সাহেবের এক ভাই নাকি রাতলাম না নীলগিরিতে থাকে। তাছাড়া আর কোথাও কেউ আছে কিনা ও জানে না। সাহেবের যত মনের কথা হয় সব ঐ ঘোড়ার সঙ্গে। যত যত্ন ঐ পশুকে। দিনের শেষে সাহেব কাজ থেকে ফিরলে পরে টিমা হাজির হয় চা-এর ট্রে আর বিস্কুটের টিন নিয়ে। তারপর স্নানের তাঁবুতে জল, সাবান, তোয়ালে, একপ্রস্থ সাফা প্যান্ট, শার্ট, চটিজোড়া রেখে সে সরে পড়ে। ঘণ্টাখানেক পরে হাঁকডাক শুনে সে সাপার এনে হাজির করে—স্রেফ্ সুরুয়া, মাংস ও রুটি। নিত্য ঐ এক খানা।

সুরার বোতল সাহেব নিজেই খোলেন। ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থাও নিজে করেন। ফিল্টার থেকে নারকেল দড়ি মোড়া বোতলে জল ঢেলে ঝুলিয়ে রেখে যান গাছে গাছে। টিমার কাজ সেগুলোকে রোদের সময় ভিজিয়ে রাখা। সন্ধ্যা নাগাদ জল হয়ে থাকে বরফের মত ঠাণ্ডা।

পান ও বেহালাবাদন শুরু হয় মেজাজ ও মর্জিমত। টিমার তখন ছুটি। সাহেব তাঁর নিজের বিছানা নিজেই করে নিতেন। অনেক দিন ভোরে এসে সে উঁকি মেরে দেখেছে বিছানা করাই হয়নি। সাহেব বেহালার কেসটা জড়িয়েই ঘুমিয়ে

আছেন—"মাগার উস্‌কা মগজ্‌কা আন্দার জরুর একঠো ঘাড়ি হ্যায়"—ঠিক সাড়ে পাঁচটা বাজলেই তড়াং করে উঠে পড়েন—এক মিনিটও এধার-ওধার হয় না।

॥ ৭ ॥

আমি যন্ত্রপাতি মালমশলার হিসাবরক্ষক হয়ে এসেছিলাম, কিন্তু হয়ে পড়লাম 'অল-পার্পাস ম্যান'। সাহেব তাঁর অফিস-তাঁবুতে থাকলে যখন্ তখন ডাক আসতো। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক বিলি করবার দিন বলে ম্যানেজার সকাল সকাল ফিরলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক পড়লো। দেখি আমার গোপন সঙ্কল্প ফাঁস হয়ে গেছে। তাঁবুর এক কোণে উবু হয়ে বসে আছে বুধন মেট।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সাহেব প্রশ্ন করলেন, "তুমি নাকি আজ রাতে কারো নদীতে মাছ ধরতে যাচ্ছ?"

অপরাধীর দিকে চাইতেই সাহেব বললেন, "ও কিছু বলেনি। আমি জেনেছি ওর বাবার কাছ থেকে। খবরদার ওদিকে যাবে না। দুদিন হলো একটা হাতি ক্ষেপে গিয়ে দল ছাড়া। গাঁয়ের পর গাঁ উচ্ছেদ করে দিচ্ছে। ওর বাবা হচ্ছে সুন্দ্রো গ্রামের মোড়ল। সে আমার কাছে এসেছিল পাগলা হাতিটার খবর দিতে। এখানে এসে ছেলের কাছে শোনে তুমি নাকি এক টাকা বকশিশ দেবার লোভ দেখিয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে আজ রাত্রেই ঐ পথে যাবার মতলব করেছ—কি এত মাছ খাওয়ার লোভ!"

"লোভ নয়, বাজি—প্রেস্টিজের প্রশ্ন—"

বদমেজাজী সাহেবের মনে কিসে যে মজার উদ্রেক হতো বোঝা ভার। হা হা করে হেসে উঠে বললেন, "হাতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। তুমি তো এদের ভাষা জানো না—কোথায়, কেমন করে মাছ ধরবে তা জানো?"

বললাম, "ইউসুফের কাছে শুনেছি, কুন্দ্রাপানি কিংবা কারো নদীর কোন কোন জায়গায় গভীর জলে বড় বড় মাছ থাকে। রাতের অন্ধকারে জলের ধারে ধারে মশাল জ্বালিয়ে ছুটলে মাছগুলো নাকি আলোর টানে ভেসে ওঠে, তখন ওরা তীর দিয়ে মেরে ডাঙায় তোলে। এই লোকটার কথা উনিই বলেছিলেন। এ নাকি মাছ মারায় ওস্তাদ। আমাকে দেখিয়েছে সরু সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা তীর।"

"ইউসুফ দেখছি অনেক দুর্বুদ্ধি ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে তোমার মাথায়। তুমি এক টাকা বকশিশ দেবে বলে লোভ দেখিয়েছ। হপ্তাভোর খেটে যাদের আঠারো আনা রোজগার হয় তাদের কাছে এক টাকা হচ্ছে ফরচুন কাজেই রাজী হয়ে গিয়েছে। ভাগ্যিস ওর বাবা এসেছিল! দিনের আলোতে যাওয়াই ফুলহার্ডি, আবার রাত্রে—ডোণ্ট বি সিলি!"

ঠিক সেই সময় বোস কতকগুলি চিঠি নিয়ে এল সই করাতে। হয়তো কথাবার্তা শুনেও থাকবে। আমি বলে বসলাম, "যখন কথা দিয়েছি তখন আমাকে চেষ্টা করতেই হবে।"

কেন জানি না এই রুক্ষ প্রকৃতির পাগলা সাহেব আমাকে প্রথম থেকেই সুনজরে দেখেছিলেন। বোসের সামনে বীরত্ব প্রকাশ করতে দেখে হেসে ফেললেন। বললেন, "আচ্ছা বেশ! বোস, তোমার অফিস-তাঁবু থেকে এক ইঞ্চি স্কেলের বড় ম্যাপখানা নিয়ে এস তো।"

এবার বুধুনকে বিদায় দিয়ে নক্সা খুলে আমাদের একটি নীল পেনসিলের দাগ দেখালেন। সিংভূমের ২'৪৭ বর্গমাইল ইজারা এলাকা থেকে উত্তরপশ্চিমে। বললেন, "বার্ডের এই ম্যাঙ্গানিজ আকরটার সীমানা জরিপ করতে এসে ঐখানে ক্যাম্প করি। রেল পাতা হবে বলে তখন এদিকে পাথর কাটা হচ্ছে। গাঁয়ের লোকেরা ঠিকাদারকে ধরে সেই সুবাদে পুরনো পুকুরটাকে বাড়িয়ে নেয়। সে বছর বর্ষার পর বাঙালী ঠিকাদার তার মধ্যে কিছু মাছ ছেড়েছিল। শুনেছি সেই ছোট্ট গ্রামে—জাস্ট এ হ্যামলেট—বসন্ত রোগ দেখা দিতে লোকগুলো সব পালায়। তারপর সেই কণ্ট্র্যাক্টার অন্য জায়গায় আরও বড় কাজ পেয়ে চলে যায়। এখন আর কুঁড়েঘর কটার হদিস পাবে না, জঙ্গলে গ্রাস করে থাকবে—কিন্তু পুকুরটা নিশ্চয় আছে। সার্ভেয়ারবাবু পথ চেনে। তাকে নিয়ে চলে যাও কাল সকালে—দু' চারটে ডায়নামাইটের স্টিক আর ফিউজ আমি দিয়ে দেবো।"

সাহেব নিজের কাজে মন দিতে আমি ম্যাপখানি নিয়ে কেশবাবুর সন্ধানে গেলাম।

বিকেলের দিকে বোস ও কেশবাবুকে ডেকে নিয়ে গোপনে পরামর্শ করে স্থির হলো, ভোরবেলা চা খেয়েই তিনজনে বেরিয়ে পড়বো।

রাতে তার ছোট প্রাইমাস্-স্টোভে বোস কিছু আলু-পেঁয়াজের ভাজি বানিয়ে নিল। ম্যানেজার সাহেবের পাচক টিমা হাতেগড়া রুটি বানিয়ে দিল। সেই সব আহার্য বস্তু ও জলের পাত্রের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিলাম বন্দুক, কার্তুজ,

বিস্ফোরণের সরঞ্জাম আর টাঙ্গি। বোস তার প্রিয় ছড়িটাও হাতে নিল।

এপ্রিল-মে মাসেও ১৭০০ ফুট উঁচু জঙ্গলা পাহাড় অঞ্চলে বেলা আটটা-নটা পর্যন্ত কনকনে শীত থাকে। তারপর ক্রমশঃ রোদ্দুর চড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও বন্ধুর পথ দিয়ে চলার পরিশ্রমে সাজসরঞ্জাম হয়ে ওঠে বোঝার মত।

আমি বুশ শার্টের দুই ঝোলা পকেটে পুরে নিয়েছিলাম বন্দুকের কার্তুজ ও ডায়নামাইট। কাঁধে নিয়েছিলাম কেশবাবুর দুই-নালা বারো বোর বন্দুক। ক্যাম্পের সহকর্মীদের ধারণা আমি যখন পূর্ব আফ্রিকা থেকে এসেছি তখন নিশ্চয় খুব মস্ত শিকারী। অতএব আত্মমর্যাদার খাতিরে আমাকে ক্রসের মত বহন করতে হলো আত্মরক্ষার যন্ত্রটিকে।

শিকার করার উত্তেজনায় বন্দুকের ভার টেরই পাওয়া যায় না, কিন্তু সেদিন আমরা প্রথম থেকেই স্থির করেছিলাম যে একমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হলে বন্দুকের ব্যবহার করব না।

রাত্রে আহারের সময়ে পিসেমশাই-এর সিংহ, গণ্ডার ও হাতি শিকারের শোনা গল্প এমন জমিয়ে করতাম যেন কতই পাশে থেকে প্রত্যক্ষদর্শী। সরাসরি মিথ্যা কথা না বললেও ভুল ধারণা সৃষ্টি করার জন্যে আমার এই বিড়ম্বনা, আমি বন্দুক হাতে কাছাকাছি থাকলে যেন সকলে ভরসা পায়।

কেশবাবু তাঁর অভ্যস্ত হাতে টাঙ্গির আঘাতে ঝোপঝাড় কেটে পথ করে দিচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল ফিউজ আর ডেটনেটর। বোস আহার্য, জল ও তার ছড়িটা নিয়ে পিছন পিছন আসছিল।

দুবার ঝর্ণার জলের নালা আর ছোট ছোট পাহাড় অতিক্রম করে আমরা রেলপথের টেলিগ্রাফ পোস্ট দেখতে পেলাম। তারপর লাইন পার হয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক শালবনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এসে পড়লাম আম-কাঁঠাল গাছের তলায়। বেলা তখন প্রায় দেড়টা। কেশবাবু বললেন, "ঐ যে টিলার ওপর শিমুলগাছ—তার ওপারেই সেই পুকুরটা। আর মাত্র দু ফারলং চড়াই উঠলেই হবে, তারপর কিছুটা ঢালু।"

এতক্ষণ অজস্র বনমোরগ, ময়ূর আর হরিণ দেখেছি গাছের ফাঁকে ফাঁকে। পলাশ, কাঞ্চন আর শিমুল ফুলের সৌন্দর্য চোখে পড়েও পড়েনি কারণ ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল। কোনক্রমে গাছতলায় পৌঁছে ছায়াচ্ছন্ন এক জায়গায় শুয়ে পড়লাম। বোস তার স্বাভাবিক দক্ষতা ও পারিপাট্যের সঙ্গে খাবারের ব্যবস্থা করে ফেললো।

পরিত্যক্ত পুকুরের অবস্থা দেখে আমাদের তো মন খারাপ। দেখি জল শুকিয়ে প্রায় তলায় ঠেকেছে আর পাঁকের উপর অজস্র বন্যজন্তুর পায়ের দাগ। কেশবাবু বললেন, "ওর ভেতর মাগুর ছাড়া আর কোন মাছ মিলবে বলে মনে হয় না!"

আমি বললাম, "ক্যাট্‌ফিশ তো খুব উপাদেয় মাছ। পুকুরের মধ্যে ঐ পাথর ব্লাস্ট করলে যা কিছু আছে ভেসে উঠবে। দেখি চেষ্টা করা যাক।"

বিস্ফোরণ হলো বিকট শব্দে—পর পর তিনবার। আমরা শিমুলগাছের মোটা গুঁড়ির আড়াল থেকে দেখলাম কাদা, জল ও পাথরের ফোয়ারা। তারপর ছুটে গিয়ে দেখি কয়েকটা বড় বড় ব্যাঙ ছাড়া আর কোন জীব মারা পড়েনি। কেশবাবু তাঁর হাফপ্যাণ্ট, জুতো, মোজা খুলে হাঁটুজলে নেমে অনেক কাদা ঘাঁটাঘাঁটি করেও মাগুরের খোঁজ পেলেন না।

ছাপা নক্সার উপর কালি দিয়ে রেলপথ আঁকা মিলিয়ে দেখলাম। ম্যানেজার সাহেব যে এই পুকুরের কথাই বলেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। ভাবলাম হয়তো বাইসন বা হাতির দলাইমলাইতে মৎস্যকুলের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়ে থাকবে। বোসকে প্রশ্ন করলাম, "আজ কার রাঁধবার পালা হে?"

"বক্সীবাবুর—"

বললাম, "ভালই হয়েছে—উনি তো মৌতাতের মেজাজে চোখেই দেখেন না। বেশ বড় বড় ব্যাঙের ঠ্যাং কেটে আলুর দমের মধ্যে ফেলে দিলেই হবে। মাছ বলে চলে যাবে—"

আমার উপস্থিত-বুদ্ধির ওপর বোসের যথেষ্ট আস্থা ছিল, কিন্তু হঠাৎ এই উৎকট প্রস্তাবে একেবারে থ হয়ে গেলো। কেশবাবু ততক্ষণে তাঁর কর্দমাক্ত অধোবাসটিকে শুকাতে দিয়ে হাফপ্যাণ্ট ও মোজা পরে উঠে এসেছেন। বললেন, "তাহলে যে আমাদের খাওয়াটাই মাটি হয়ে যাবে—আলুগুলোও বেছে খাবার প্রবৃত্তি হবে না।"

বললাম, "কেন ফ্রান্সে, চীন দেশে ব্যাঙ তো অতি সুখাদ্য!"

বোসের এবার কথা ফুটলো, বললে, "আমি ও জিনিস মুখে দিতে পারবো না।"

অগত্যা আমাকে পরাজয় স্বীকার করে ফেরার পথ ধরতে হলো।

রেলের লাইন পার হওয়ার সময় হঠাৎ মনে পড়লো জামদা গাঁয়ের কাছাকাছি কোথাও রেল কোম্পানির ঠিকাদার হেম ব্যানার্জি ক্যাম্প ফেলেছেন, তিনি সুকেশবাবুর কে যেন হন। হৃষ্টপুষ্ট দোহারা চেহারা, মাথায় এক বিরাট সোলার

টুপি। একদিন দেখা হতে তার তাঁবুতে বেড়িয়ে আসতে বলেছিলেন। ভাবলাম ঐ রকম প্রফুল্ল মোটাসোটা লোকেদের মনটা দরাজ হয়ে থাকে—হয়ত টিনের বিলিতী মাছ মিলতেও পারে। আমার প্রস্তাব শুনে কেশবাবু শঙ্কিত হয়ে বললেন, "সে কি? তিনটে বেজে গেছে, ক্যাম্পে ফিরতে রাত হয়ে গেলে মুশকিল হবে, সঙ্গে বাতিও নেই।"

আমি বললাম, "আমাদের ক্যাম্পটা তো ওদিকেই। সন্ধ্যে হয়ে গেলে ওঁর তাঁবু থেকে একটা মশাল জ্বেলে সঙ্গে নিলেই হবে।"

তখনও সূর্যের আলো প্রখর রয়েছে। বোস আমার মতই আশাবাদী। বললে, "তিনি নাও থাকতে পারেন কিন্তু ওঁর চৌকিদার আমাকে চেনে, বাতি নিয়ে এগিয়ে দিতেও পারে।"

কেশবাবুর আর কিছু বলবার রইল না।

ব্যানার্জি সাহেবের ক্যাম্পে পৌছতে সন্ধ্যা হয়ে এল। পৌছেই চোখে পড়ল তাঁর পাচক বনমোরগের পালক ছাড়াচ্ছে। বললে, "এইমাত্র সাহেব চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে হাটের দিকে গেলেন। গাঁয়ের বাইরে এক বাঘ গরু মেরেছে—"

আমি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। এতদিন কেবল বাঘের গল্পও দূর থেকে শব্দই শুনে এসেছি, কিন্তু শিকার করার সুযোগ আসেনি। দেখি বরাতে কি আছে!

কিছু পথ গিয়েই দেখতে পেলাম হেমবাবুকে ঘিরে কয়েকজন গ্রামবাসী জটলা করছে। সেদিন হাটবার ছিল, কিন্তু দিনের আলো থাকতে থাকতেই দূরের লোকজন তাদের সামান্য পণ্যদ্রব্য হাঁড়িকুড়ি, চুপড়ি, লাউকুমড়ো ও চাল-নুন কেনাবেচা করে চলে যায়। কয়েকটি স্থানীয় লোক হাণ্ডিয়ার কলস ও শিয়াড়ী-পাতার চোঙা নিয়ে মৌতাত জমিয়ে বসেছিল, এমন সময় নাকি গ্রামে প্রত্যাগত গরুর পাল আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে ছুটে আসে। রাখাল দেখতে পায় একটি গাভীকে ঘায়েল করে বিরাট আকৃতির এক বাঘ পথের মাঝে বসেই ভক্ষণ শুরু করে দিয়েছে। সে-ই ছুটে গিয়ে ঠিকাদার সাহেবকে ডেকে আনে। বর্তমানে ব্যাঘ্রটি গাভীর বুক থেকে অনেকখানি রক্তমাংস খেয়ে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। দেখলাম পশুর আংশিক ভুক্ত দেহ আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছে। শুকনো মাটি সদ্যনিঃসৃত রক্তের অনেকখানি শুষে নিয়েছে।

হেমবাবুর হাতে কিন্তু কোনো বন্দুক দেখলাম না। তিনি আমাদের দেখে খুশী

হয়ে এগিতে আসতে আমি সামনের একটি বড় ডালপালাওলা গাছ দেখিয়ে প্রস্তাব করলাম, "ওর ওপর একটা মাচা বাঁধবার ব্যবস্থা করান, বাঘ নিশ্চয় ফিরে আসবে—"

হেমবাবু বললেন, "ও আজকের মত পেট ভরে খেয়ে গেছে। হয়তো বাকিটা সরিয়ে রাখবার জন্য আসতে পারে। আপাতত আড়াল থেকে আমাদের আলাপ-আলোচনা শুনছে। এখন মাচা বাঁধতে গেলে সাবধান হয়ে যাবে। কাল সকালে যাহোক করা যাবে। এদের বলেছি মরা গরুটার দুটো ঠ্যাং দড়ি দিয়ে ঐ কেন্দু-গাছের সঙ্গে বেঁধে চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে। তাছাড়া মাঝে মাঝে টিন পেটালেই হবে। সব ব্যবস্থা হয়েছে। চলুন, চলুন, অন্ধকার হয়ে এল।"

তিনি আমাদের একরকম টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর তাঁবুতে। আমি ব্যাঘ্র-শিকারে আগ্রহ প্রকাশ করতে হেসে বললেন, "তা বলে আপনার ঐ বারো বোর বন্দুক দিয়ে কোনও বড় জানোয়ার মারবার চেষ্টা করবেন না—বিশেষ করে মাটিতে দাঁড়িয়ে। কাল আবার আসবেন তখন মাচা তৈরি থাকবে।"

আতিথেয়তার জন্য হেমবাবুর সুনাম ছিল। সে কথা বোস পথেই বলেছে। তাঁবুর ভেতর গরমজলে হাত-মুখ ধুয়ে প্রথমে একপর্ব চা খাওয়া হলো। ইতিমধ্যে আড়চোখে দেখে নিয়েছি নানাপ্রকারের হাণ্টলীপামার বিস্কুট থেকে শুরু করে হরেকরকম বিলিতি খাদ্যবস্তুর টিনে তাক ভর্তি। মনে আশার সঞ্চার হলো। হৃদ্যতা জমে উঠতে একফাঁকে বাজির কথাটি বলে ফেললাম। তিনি সরবে উচ্চ-হাসি হেসে বললেন, "মশাই, ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারগুলোকে খাইয়ে তুষ্ট করা হচ্ছে আমাদের ব্যবসার অপরিহার্য অঙ্গ—সব কিছু মজুদ রাখতে হয়। সুইডিশ সার্ডিন, হেরিং, স্কটিশ সামন্ এসবের নমুনা আজকের ডিনারের মেনুতেই আছে। খেয়ে দেখবেন এবং সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

বললাম, "সে কি? আমাদের যে সকাল-সকাল ফিরতে হবে। দেখছেন, ঘোর অন্ধকার হয়ে এল, সঙ্গে কোন বাতিও আনিনি—একটা যদি মশাল দেন!"

হেমবাবু বললেন, "পাগল নাকি, আপনাদের যখন পেয়েছি তখন সহজে ছাড়বো ভেবেছেন? মুখ-হাত ধোয়ার সময়েই আমি ডিনারের অর্ডার দিয়ে এসেছি। আপাতত কিছু গান শুনুন, নতুন রেকর্ড আনিয়েছি। ফেরার জন্যে ভাববেন না, সে ব্যবস্থা আমার।"

তারপর তিনি লম্বা চোঙওলা, হাতে দম দেওয়া 'হিজ্ মাস্টারস্ ভয়েস্' গ্রামোফোন বের করে আনলেন। এ যন্ত্রটি আমাদের ক্যাম্পে কারো ছিল না।

না থাকাটা এক হিসেবে সৌভাগ্যই বলতে হবে—নাহলে একই গান বার বার শুনতে হতো আর সে আওয়াজ অরণ্যের স্বাভাবিক ধ্বনিগুলি থেকে আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করতো। তাছাড়া ম্যানেজারের বেহালা ও আমাদের যান্ত্রিক গানে যে বিরোধ বাধতো তাতে সন্দেহ নেই। তখনকার মত গান শুনতে ভালোই লাগলো—রামপ্রসাদী, নানা ধরনের কীর্তন আর কয়েকখানা থিয়েটারের গান।

ভূরিভোজন করে খাওয়া সারতে আটটা বেজে গেল। পোলাও, মুরগী, মাছ ও টিনের বিলিতি ফল তো খাওয়ালেনই, সঙ্গে আবার কয়েকটা মাছের টিন দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "আমার রাইফেলটা রেলের ইঞ্জিনীয়ার সাহেব নিয়ে গেছেন শিকার করতে। আপনাদের দু-নলা বন্দুকটা যদি রেখে যান বড় ভাল হয় —যদি বাঘটা আসে, গাঁয়ের লোকেরা ডাকাডাকি করে! আপনাদের আমি একটা ছোট শট্‌গান্ দিচ্ছি—আত্মরক্ষার পক্ষে এই যথেষ্ট। তবে ব্যবহার করার দরকার হবে না, কারণ আপনাদের সঙ্গে একটা নতুন হারিকেন লণ্ঠন দিচ্ছি। আলো থাকলে জানোয়ার কাছে ঘেঁষবে না।"

তিনি এবার কেশবাবুকে ক্যাম্পে ফেরার সোজা পথটা বুঝিয়ে দিলেন।

কেশবাবু জানিয়ে দিলেন যে তিনি ঐ পথটা জানেন। দুবার একটা নালা আর একবার একটা ছোট পাহাড় পার হতে হবে।—"ঐ দিক থেকেই তো আমাদের লোকজনেরা হাটে আসে।"

আমরা হেমবাবুকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলাম।

আমি শট্‌গানের মধ্যে একটি বল ভরে, ট্রিগার তুলে আগে আগে চললাম। কেশবাবুর হাতে লণ্ঠন আর টাঙ্গি। বোসের হাতে তার প্রিয় বেতের ছড়ি। অবশ্য ওদের দুজনেরই ভরসা আমার বন্দুক।

রেল লাইনের দুদিকে খানিকটা খোলা জায়গা অতিক্রম করবার পর আমরা জঙ্গলের মধ্যে পায়ে-চলা পথ ধরলাম। কেশবাবু সাবধান করে দিলেন যে, এদিকের গাছপালা খুব ঘন, বিষাক্ত মাকড়সার পুরু জালে আর কাঁটাগাছের ঝোপ-ঝাড়ে ঠাসা। আরো বললেন যে, জানোয়ারেরা নিঝুম রাতে এই পথেই যাতা-য়াত করে। আজ হাটের জন্য মানুষের চলাচল বেশি তাই এদিকে আসবে বলে মনে হয় না। তবে ভাল্লুককে বিশ্বাস নেই। ওরা খুব খানিকটা মহুয়া খেয়ে ফেললে মাথাগরম বেপরোয়া হয়ে যায়। একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়লে বন্দুক চালাবার সময় পাওয়া যাবে না। এদিকে অবশ্য কোন মানুষখেকো বাঘ নেই—তবে এসে পড়তে কতক্ষণ—ওরা কাঁটাঝোপ পছন্দ করে না সেই যা ভরসা,

নালার কাছে গেলে নজর রাখতে হবে। যে রকম আগুন লেগেছে ওদিকের পাহাড়গুলোতে, অনেক কিছু জলের খোঁজে মরীয়া হয়ে চলে আসতে পারে এদিকে।"

কেশবাবু সাধারণতঃ কম কথা বলেন। আজ মনে হলো পথ সম্বন্ধে সন্দিহান অথবা পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন বলেই অবিরাম বকে যাচ্ছেন। আমার কিন্তু শুকনো পাতার উপর মড়মড় শব্দে পা ফেলে এগিয়ে যেতে খুব আনন্দ হচ্ছিল। বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে সামনের দিকে তাগ করে চলছিলাম। বোস কাছাকাছি ছিল। কোন কথা বলবার সুযোগ পায়নি সে। হঠাৎ ফিসফিস করে বললে, "কারা যেন দল বেঁধে আসছে।" সারভেয়ার নীরব হয়ে গিছলেন। এত রাত্রে হাটের দিনে লোকজনের বিপরীত দিকে যাওয়ার কথা, কিন্তু সামনের দিক থেকে আসে কারা? হয়ত শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছে!

বন্দুকটা কাঁধে ফেলে একটা মোটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়তে মত্ত কণ্ঠে কথাবার্তা কানে এল। কেশবাবু চুপিচুপি বললেন, "ওরা কোল!" গাছের ফাঁক দিয়ে মশালের আলো দেখা যেতেই আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপলো। বোসকে বললাম, "চট্ করে হারিকেনের বাতিটার পলতে নামিয়ে দাও। কোলেরা নাকি একজোটে থাকলে বাঘকেও ডরায় না, এই ঝোপের নিচে লুকিয়ে পড়া যাক। দেখি ওদের কেমন সাহস!"

আমার বাতিটার আলো খুব কমিয়ে গাছের পাতায় ঢেকে দিয়ে নিজেরাও লুকিয়ে পড়লাম। দলটা খুব কাছে আসতেই আওয়াজ করলাম—আহার-রত বাঘের গলার গরগর ধ্বনি: এ শব্দ ওভারসিয়ার সোয়ারিস আমাকে শিখিয়েছে। সে ছিল পশু-পাখির ধ্বনির অনুকরণে নিপুণ।

আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা টাঙ্গি আমার নাক ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে পাশের গাছের গুঁড়িতে বিঁধলো। বিপদের সঙ্কেতে আমি তৎক্ষণাৎ বন্দুক ফেলে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে উঠলাম। দেখলাম আমার সঙ্গীরাও হাত তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে। মশালের আলোতে আমাদের সুস্পষ্ট দেখা গেল। আমরাও দেখলাম দশ-বারোজন লোক টাঙ্গি তুলে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বাঘ হলেও তার পালাবার কোন পথ থাকতো না। দলপতি হাত তুলে অন্যদের থামিয়ে দিল, যেন টাঙ্গি না ছোঁড়ে। দেখি সে আমাদের কোম্পানির একজন মেট, আমাকে চিনতে পেরেছে। আমাদের মুখ দিয়ে কোন কথা বার হবার আগেই সে বলল, "এভাবে ভয় দেখানো আপনাদের ঠিক হয়নি। আজ হাটের দিন, পেটে হাঁড়িয়া পড়েছে—

জানোয়ার ভেবে মেরে বসলে সকলের ফাঁসি হতে যেত।"

ওদের দুজনের পিঠে দেখলাম মাদল। আর কথা না বলে জামদার দিকে রওনা দিল। বুঝলাম নাচের তাড়া আছে।

কয়েক মুহূর্ত অপদস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ দেখি অন্ধকার। বোস লণ্ঠনটা তুলে উত্তেজনার মাথায় পলতে বাড়াতে গিয়ে উল্টো ঘুরিয়ে বাতিটা একদম নিবিয়ে ফেলেছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখি দেশলাই নেই—মনে পড়লো সেই পুকুরটার পাশে ফেলে এসেছি।

এখন কি করা যায়!

বোস বলল, "ওদের ডাকা যাক। ওদের মশালের আগুন দিয়ে পলতেটা ধরিয়ে নিই।"

আমার আর ওদের ডাকার ইচ্ছে ছিল না—যা ধমক খেয়েছি! তাছাড়া হয়ত আসতে চাইতো না। কেশবাবুকে বললাম, "ঐ তো নালার জলের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের পাহাড় তো কাছেই। আপনি কি এইটুকু পথ চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন না?"

কেশবাবু বললেন, "নিশ্চয় পারবো। ওরা তো ক্যাম্পের নিচের নালার ধার থেকেই এল। তাছাড়া এখন তো আকাশের আলোয় পথ বেশ দেখা যাচ্ছে।"

আগের মত আবার যাত্রা আরম্ভ করলাম, সামনে আমি বন্দুক হাতে, তারপরে কেশবাবু ও সব পেছনে বোস।

॥ ৮ ॥

প্রথম প্রথম জঙ্গলের অন্ধকার রূপকে রীতিমত ভয় করতাম। অকারণ আতঙ্কে মনের চোখ বন্ধ থাকতো। তারপর যখন ক্যাম্পের বিভিন্ন তাঁবুতে যাতায়াত শুরু করতে হলো—ওষুধ দিতে, শুশ্রূষা করতে, অথবা বাদ-বিতণ্ডার মীমাংসা করে আসতে, তখন অনেক সময় অভ্যস্ত পথ দিয়ে রাতের বেলায় বিনা আলোতেই যাতায়াত করতে হয়েছে। রোগে ক্লিষ্ট সহকর্মীদের কাছ থেকে ডাক আসতো যখন-তখন। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা বোস কিংবা আমার সঙ্গ পেলে অনেক সান্ত্বনা পেত। আমরা পালা করে যেতাম তাদের কাছে। অন্ধকারে চোখ ও মনের নিবিড় সংযোগে দৃষ্টির প্রখরতা যেমন বেড়ে গিছলো তেমনি সজাগ হয়েছিল

কান। বিপদের সম্ভাবনায় মন স্বতই সতর্ক হয়ে উঠতো।

সেদিন পথের মাঝে লণ্ঠনের আলো নিবে যাওয়ার পর থেকেই মন বলছিল আজ কোন আপদ ঘটতে পারে। বন্দুকের নলটাকে সামনের দিকে উঁচু করে ধরে এগিয়ে চলেছি। বোস ও কেশবাবু কাছ ঘেঁষে পিছন পিছন হাঁটছে। হঠাৎ দেখি রাস্তাটা ভাগ হয়েই দুপাশে চলে গেছে। কান পেতে শুনলাম বাঁদিক থেকেই আসছে জলস্রোতের মৃদু আওয়াজ। কেশবাবুর মুখের দিকে চাইতেই তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে, লোকগুলো এদিক থেকেই এল। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ যেন এদিক থেকেই আসছে।"

বুঝলাম কেশবাবুর কাছ থেকে সঠিক পথনির্দেশ আশা করা বৃথা। তবু সেই দিকেই মোড় ঘুরলাম।

পাহাড়ী নালার জল খরস্রোতা। শব্দ সুস্পষ্ট কানে এলেও ভরসা হচ্ছিল না। জল দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশুর মলমূত্রের উগ্র গন্ধ পেলাম। কেশবাবুর মুখে আর কথা সরে না। সভয়ে দেখালেন নালার ওপারে কয়েক জোড়া জ্বলন্ত চোখ —নীল ও সবুজের সঙ্গে সোনালীর মিশ্রণ। আকাশের অজস্র নক্ষত্র এবং এক খণ্ড কাস্তের আকারের চাঁদের অল্প আলোয় দেখতে পেলাম, আমরা একটা কর্দমাক্ত জায়গায় এসে পড়েছি আর তার উপর বড় বড় পশুর যাতায়াতের পদচিহ্ন।

আর কালবিলম্ব না করে ফিরে এলাম সেই মোড় পর্যন্ত। আমাদের দ্রুত পদক্ষেপে সন্ত্রস্ত হয়ে তিন-চারটে বড় বড় সম্বর প্রায় ঘাড়ের উপর দিয়েই ছুটে পালাল। এবার ডানদিকের রাস্তা ধরলাম। অবশ্য যদি পায়ে-চলা-পথের রেখাকে রাস্তা বলা যায়।

এদিকটা দেখলাম তেমন পর্বতসঙ্কুল নয়। ক্রমশঃ জলের আওয়াজও মিলিয়ে যেতে বুঝলাম নালা ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছি।

শুনেছিলাম মানুষ ও পশু যাতায়াতের পথের তফাৎ বুঝতে হলে গাছের গুঁড়ির উপর লক্ষ্য রাখতে হয়। অনেক সময় তরুণ হরিণের শিং ঘষার দাগ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া হাতির দাঁতে গাছের ছাল উপড়ে ফেলার চিহ্ন সহজেই চোখে পড়ে। গাছের তলায় পশুর মলের আকার দেখে বোঝা যায় কোন্ এলাকায় কোন্ জানোয়ারের প্রাদুর্ভাব বেশী। ধাতু-পাথর সমাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে অবশ্য পদচিহ্ন বড় একটা চোখে পড়ে না। ময়ূরের পেখম তুলে নাচের ভঙ্গিমা দেখলে আন্দাজ করা যেত কাছাকাছি বাঘ আছে। বাঘ আর ময়ূরের মধ্যে এই প্রীতির সম্পর্কের কারণ ঠিক জানি না। জামদার হাটে মাঝে মাঝে বড় বড় জীবন্ত

ময়ূর বিক্রী হতো। শুনেছিলাম জঙ্গলের বাসিন্দারা এদের ধরতো বাঘের চামড়ার অনুকরণে কালো হলুদ ডোরাকাটা কাপড় মুড়ি দিয়ে।

অবশ্য আলোর অভাবে এই সবের কিছুই দেখতে পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তবুও মরীয়া হয়ে এগিয়ে চলছিলাম। ক্রমশঃ ঝোপঝাড়, মোটা মোটা গুঁড়ির গাছ পার হয়ে এসে ঘন শালবনে ঢুকলাম। বেশ বুঝতে পারলাম দিগ্‌ভ্রম হয়ে আমাদের পরিচিত পরিবেশ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি। মনের মধ্যে এই সংশয় ও আশঙ্কার উৎপত্তি হচ্ছিল নিশাচর পশুপক্ষীর অচেনা ধ্বনি থেকে।

উলিবুরু পাহাড়ের জীবজন্তুর আনন্দ, উন্মাদনা, জৈবিক প্রজননের আহ্বান ও তার উত্তর, এমন কি মরণপণ যুদ্ধের গগনভেদী আওয়াজ পর্যন্ত প্রায়ই একই দিক থেকে কানে আসতো। সে-সব শব্দ আমাদের পরিচিত হয়ে গিয়েছিল।

এখানে সব কিছুই মনে হচ্ছিল অচেনা এবং আমাদের অনধিকার প্রবেশে বিরূপ ও রুষ্ট।

বোস ও কেশবাবু একেবারে নির্বাক। আমিই কেবল নিজের কণ্ঠস্বর থেকে আশ্বাস পাওয়ার ভরসায় নানারকম বীরত্বব্যঞ্জক কথা বলে চলেছিলাম। ভাবছিলাম জোর গলায় কথা বলে গেলে পশুরা আড়ালে সরে যাবে। কতক্ষণ এভাবে চলেছি স্মরণ নেই। মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল। তারপর হঠাৎ দেখি পথ বাঁদিকে প্রশস্ত হয়ে ঘুরে গেছে। সরু সরু ঋজু শালগাছের ফাঁক দিয়ে আলো-অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেলো সামনে একটা ক্ষেত। সেই সঙ্গে জলপ্রবাহের শব্দও কানে এল।

ভাবলাম নিশ্চয় কোন আদিবাসীদের গ্রাম আছে কাছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়েই দেখি সামনে একটা বাঁধ ও নিচে ছোট চাষজমি। ঠিক সেই সময়ে কেশবাবুর ভয়ার্ত কণ্ঠ কানে এলো। পিছন দিক থেকে আমার জামার কলার টেনে ধরে ফিস ফিস করে বললেন, "বাঘ, পিছনে—"

বোসও নিমেষের মধ্যে আমার আড়ালে এসে সেই কথাই বললে আরও ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবে। কানে এল শুকনো পাতার উপর ধীর সন্তর্পণ পদক্ষেপ, খুব কাছেই— পরমুহূর্তে সব নিঃশব্দ। গাছের আড়ালে কোন জলন্ত চোখ দেখতে পেলাম না, কিন্তু মনে হলো এখুনি কোন হিংস্র জন্তু ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর।

সঙ্গী দুজনকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে বন্দুকের নলটা দু'হাতে শক্ত করে ধরে কাঠের কুঁদোটা সামনের দিকে কাত করে ধরলাম। গুলি চালাবার লক্ষ্যবস্তুকে যখন দেখতে পাচ্ছি না তখন বাঁটের দ্বারা আক্রমণকারীর মুখের উপর আঘাত করাই এক্ষেত্রে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়। পরক্ষণেই দেখি বোস পালাতে গিয়ে

বাঁধের ঢালু গা বেয়ে গড়িয়ে পড়েছ।

সঙ্গে সঙ্গে কেশববাবুর সতর্ক কণ্ঠস্বর কানে এল, "বোসবাবু সাবধান, ভাল্লুক!"

দেখি বিরাট আকারের এক ভাল্লুক দু'হাত উঁচু করে বোসকে প্রায় ধরে ফেলেছে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম সবুজ ও নীলে মেশানো একজোড়া জলন্ত চোখ। বন্দুকখানা ঘুরিয়ে নিয়ে দিলাম ঘোড়া টিপে। অন্ধকার চিরে অগ্নিপিণ্ডটি তির্যক গতিতে উল্কার বেগে ছুটে গিয়ে কিসে যে বিদ্ধ হলো বুঝতে পারলাম না—শুধু কানে এল মানুষের অপঘাত মৃত্যুকালের তীব্র যাতনাব্যঞ্জক আর্তধ্বনি।

এই দুঃসহ মরণকান্না শোনার অভিজ্ঞতা আমার আগে হয়েছিল।

তখন আমার ছেলেবেলা, প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে। ফন লেটো নামে এক জার্মান সেনাপতি মাত্র মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে ব্রিটিশ নায়ক পরিচালিত বহু সহস্র ভারতীয় সেনার মৃত্যু ঘটায়। হতাহতের সংখ্যা এত বেশী হয় যে আহতদের তুলে নিয়ে আসার জন্য স্ট্রেচার অকুলান হয়ে পড়ে। তখন তিন-চারজন করে আহত ভারতীয় সৈনিককে একসঙ্গে জালের মধ্যে ঝুলিয়ে এনে ফেলা হতো পূর্ব-আফ্রিকার নাইরোবিতে আমাদের বাড়ির সামনে একটি মাঠে। অহর্নিশ শুনতে হতো তাদের হৃদয়বিদারক মরণকান্না। আজ এ যেন তারই প্রতিধ্বনি।

ইতিমধ্যে বাঘের কথা ভুলেছিলাম।

স্মরণ হতেই ক্ষিপ্রহাতে আর একটি গুলি বের করে বন্দুকে ভরতে গিয়ে দেখি আগেকার টোটার খোলটা এমন ভাবে আটকে গেছে যে বার করা যাচ্ছে না। অনেকদিন নল পরিষ্কার করে চর্বি মাখিয়ে না রাখলে অথবা গুলির আধারের কোন দোষ হয়ে থাকবে।

আমার মত কেশববাবুরও ধারণা হয়েছিল—বোসকেই আমি গুলি করেছি! তিনি মর্মাঘাতে জড়বৎ হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে দুজনেই দেখি বোস বাঁধের গা বেয়ে উঠে আসছে—অক্ষত দেহ।

বোস খবর দিল, একটা ভাল্লুক জখম হয়ে পড়ে আছে আর তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে জঙ্গলের ভিতর থেকে ছুটে আসতে দেখে সে পড়ি-কি-মরি-করে ঐ খাড়াই বেয়ে উঠে পালিয়ে এসেছে। আমার বন্দুকের অবস্থা দেখে কোথা থেকে তার বেতের ছড়িখানা কুড়িয়ে এনে হাজির করলো। সেটা নলের মধ্যে ঢুকিয়ে টোটার খোলটা খুলে ফেলা মাত্র কানে এল বন্দুকের শব্দ—কাছে জঙ্গলের ভিতর থেকে। আর সেই সঙ্গে বহুকণ্ঠের পরিচিত স্বর।

ইতিমধ্যে বন্দুকে গুলি ভরে দ্বিতীয় ভাল্লুকটার আক্রমণের প্রতীক্ষা করছি।

কেন জানি না বাঘের কথা আর মনেই হয়নি।

বোস ও কেশবাবু উচ্চৈঃস্বরে জানান্ দিল—আমরা কোথায়। দেখি পেট্রো-ম্যাক্সের উজ্জ্বল আলো, মশাল ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একদল লোক আসছে, সামনে ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং।

আমাদের বাক্যস্ফূরণ হবার আগেই ওভারসিয়ার সোয়ারিস একজন মেটকে দেখিয়ে বলল, "এই লোকটা দেখেছে স্যার, গুলির আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগার ওর ক্ষেতের বাঁধের ওপর থেকে একলাফে নালা পার হয়ে ঘরের পাশ দিয়ে ছুটে পালায়—আর একটু হলে—"

তার কথা শেষ না হতেই ম্যানেজার এক প্রচণ্ড ধমক দিলেন আমায়—"বাঘ শিকারের জন্য তোমার হাত নিশপিশ করছে সে খবর আমি পেয়েছি। কিন্তু এমন আহাম্মক তো কখনো দেখিনি! অন্ধকারে ঐ ছেলেখেলার বন্দুক নিয়ে—ইয়াকি পেয়েছো নাকি! কার এ বন্দুক?"

বোস অল্প কথায় সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে সাহেব তো হেসেই কুটিপাটি—"আরে টিনের মাছ তো টিমাকে বললেই দিয়ে দিত। তার জন্য এত কাণ্ড! যাও ক্যাম্পে গিয়ে বিশ্রাম কর। দ্বিতীয় ভাল্লুকটা এখন মরীয়া হয়ে আছে। আজ আর ওদিকে নয়। কাল দিনের আলোতে যা হোক করা যাবে।"

শুনলাম ছুটির দিন বলে সাহেব নাকি তাঁর পানপর্ব সূর্যাস্তের পর থেকেই আরম্ভ করে দেন। সেদিন বেহালা বাজাবার মেজাজে ছিলেন না, তাই ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ ভৃত্য টিমার তাঁবু থেকে মুক্তকণ্ঠে বচসার আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। গিয়ে দেখেন ডাক-রাণার এক হাতে চেরা-লাঠির ফাঁকে কতকগুলি চিঠি ও টেলিগ্রাম, আর এক হাতে বর্শার সঙ্গে জ্বলন্ত মশাল ধরে টিমাকে মেরেই ফেলবে বলে শাসাচ্ছে। মালেয়ালী হিসেব সরকার নায়ার গোলমাল শুনে নিজের তাঁবু থেকে ছুটে এসে বর্শাখানা কেড়ে না নিলে আর রক্ষা ছিল না।

মহুদার স্টেশন মাস্টার নাকি স্বয়ং বলে দিয়েছিলেন যে তারটা খুবই জরুরী, সেদিনই ম্যানেজার সাহেবের হাতে পৌঁছনো চাই-ই চাই, কিন্তু টিমা বাধা দিয়েছে সাহেবের কাছে যেতে, ফলে যত গণ্ডগোল।

সাহেব দেখলেন, সত্যি গুরুত্বপূর্ণ খবর। আসছে কাল দুপুরের পর যে-কোন সময়ে লর্ড কেবল-এর কন্যা তাঁর বিপুলকায় মেজাজী স্বামী বেম্বলের সঙ্গে এখানে উপস্থিত হয়ে যেতে পারেন। সঙ্গে থাকবেন রেল কোম্পানির বড় সাহেব। ম্যানেজারের নেশার আমেজ মাথায় উঠলো। তাঁর গৃহস্থালির চৌহদ্দির মধ্যে

নায়ার-এর অনধিকার প্রবেশের অপরাধ মাফ হয়ে গেল। তাকে পাঠানো হলো কেশবাবুর মেট-এর সন্ধানে। সে ছিল সাহেবের বিশ্বস্ত শিকারী এবং বিচক্ষণ পথ-প্রদর্শক। টিমার প্রতি আদেশ হলো সব কাজ ফেলে আগে তাঁর চুল কেটে দিতে। ততদিনে ঠিকাদার মারফৎ চুল কাটার উপযোগী একটি কাঁচি যোগাড় হয়েছিল।

এসব কথা নায়ার-এর মুখে শোনা।

অবশ্য বক্সী বলতো সাতঘাটের জল খেয়ে আসা এই বিচিত্র-চরিত্র লোকটির শতকরা নব্বুই ভাগ গল্পই হচ্ছে ডাহা বানানো। কিন্তু নায়ার-এর সেদিনের কাহিনী মিথ্যে নয়। সম্মানিত অতিথিদের উপযুক্ত খাদ্যবস্তু যোগাড় করতে তিনি বন্যবরাহ আর হরিণের সন্ধানে পাহাড় থেকে নেমে নালা পার হয়ে সুন্দ্রা-সাডংএর দিকে সদলবলে চলেছিলেন। আর আমরা 'সি' এবং 'জে-এস' খাদান ঘুরে দিকৃভ্রান্ত হয়ে সেদিকেই হাজির হই। সেদিন সবিস্ময়ে দেখেছিলাম সাহেবের লম্বা লম্বা ঘাড়ের চুল ও জুলফি ভদ্রস্থ করে ছাঁটা।

সগর্বে আমাদের অভিযানের গল্প করতে করতে মৎস্যাহার করাবার সময় কয়েকবার গুলির আওয়াজ পেলাম। বুঝলাম সাহেবের শিকার-চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।

পরদিন মহামান্য অতিথিরা পৌঁছবার আগেই ভাল্লুকের মৃতদেহ তুলে আনা হলো। কেশবাবু দেখালেন—গুলি লেগে মাথার খুলির এক অংশ চূর্ণ হয়ে গেছে, তারপর গুলিটি গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে পাথরের ফাটলে। আর একটি ভাল্লুকের পায়ের চিহ্ন দেখা গেল ধারে-কাছে। কিন্তু দিনের আলোয় আর সঙ্গীহারা শোকার্ত পশুটির দেখা মিললো না।

এই আমার প্রথম ও শেষ ভাল্লুক শিকার। স্থানীয় লোকদের কাছে আমার খাতির বহুগুণে বেড়ে গেল। আমিও তাদের সব প্রশংসা নীরবে হজম করলাম।

॥ ৯ ॥

আমাদের কাছে সব চেয়ে বিরক্তিকর ছিল কীট-পতঙ্গের উৎপাত। অতি অদ্ভুত আকৃতির ও উৎকট দুর্গন্ধযুক্ত পোকা বাতির আলোয় বা উনুনের আগুনে আকৃষ্ট হয়ে এসে আমাদের জীবন দুর্বহ করে তুলতো। কোন-কোনটার কামড় ছিল বিষাক্ত, অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। কোনটা এমন তুলতুলে নরম যে স্পর্শমাত্র থেঁতলে যেত।

কোনটার খোলস এত শক্ত যে ঠিকরে এসে গায়ে পড়লে রীতিমত ব্যথা লাগতো।

নিকষ কালো বিরাট ভোমরার আকারের একরকম পতঙ্গকে আমরা বেজায় ভয় পেতাম। পাথরের মত ভারী এই অপরূপ জীবটি উড়ে এসে হ্যারিকেন বাতির কাচের চিমনি ফাটিয়ে দিত বলে আমাদের সতর্ক থাকতে হতো। একবার উপুড় করে দিলে তারা অসহায়। সেই অবস্থায় তাদের আমরা মাথার মোটা মোটা সোলার টুপি চাপা দিয়ে রাখতাম।

ঠিক শুকনো কাঠি বা গাছের ভাঙা ডালের মত ফড়িংগুলো এমন নিঃসাড়ে চলাফেরা করতো যে দিনের আলোতেও তাদের জীবন্ত প্রাণী বলে চেনা যেত না। কাজের অবসরে অলসভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখে পড়তো সামনে কাঠির টুকরোটি জায়গা পরিবর্তন করছে। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে অতি সূক্ষ্ম, প্রায় অদৃশ্য হাত-পা আবিষ্কার করতাম।

বোস কিংবা আর কোন ক্যাম্পবাসীকে কিন্তু এসব বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানো যেত না। তারা এসব নগণ্য কীট-পতঙ্গকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতো না। তারা শোনাত বিকটাকার মাকড়শা বা লোমশ কাঁকড়াবিছার রোমহর্ষক গল্প। আর বলতো হরেকরকম বিষধর সাপের কথা। পথে বার হলে এই সব জীবের হামেশাই দেখা পাওয়া যেত। তবে তাঁবু বা পর্ণকুটিরের মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়ে কাউকে বিপদে ফেললে তাদের গল্পের খোরাক জুটতো। আসল ঘটনার উপর রঙ চড়তো। আর বার বার বলেও সে-সব গল্প পুরনো হতো না।

আদিবাসীরা ভয় পেতো পিঠের উপর ফুটকি দেওয়া একরকম লম্বাটে পোকাকে। আমি কেন জানি না এক-আধ ইঞ্চি মোটা মোটা শতপদবিশিষ্ট কেন্নো জাতীয় অহিংস পোকা দেখলেই স্বতই সঙ্কুচিত হয়ে উঠতাম। কে জানে ছেলেবেলার কোন বিস্মৃত ঘটনার প্রতিক্রিয়া কিনা। দেখে মনে হতো এ যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বীভৎস জীবের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

একরকম অতি ক্ষুদ্র মাছির প্রাদুর্ভাব হতো গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে। হাজারে হাজারে এসে চোখের পাতার উপর বসতে চায়। মুখের ভিতর ঢুকে পড়ে। নাসারন্ধ্রে সুড়সুড়ি দিয়ে অস্থির করে তোলে।

বোসের পরামর্শমত কাপড় ছিঁড়ে লম্বা লম্বা ফালি ঝুলিয়ে দিয়ে কিছুটা নিষ্কৃতি পেতাম। ওরা দিনের বেলায় বাদুড়ের মত একটা কিছু আঁকড়ে ঝুলে থাকতে চায়। তাই দেখতে দেখতে সাদা কাপড় কুচকুচে কালো হয়ে যেতো।

আদিবাসীরা একরকম শেয়ালমুখো বড় বড় বাদুড় খেতে বেজায় ভালোবাসতো। প্রথম দিন 'বি' খাদানে গিয়ে দেখেছিলাম, মোটা মোটা গাছের ডালে তীর-বেঁধা বাদুড় ঝুলছে। সোয়ারিস সঙ্গে ছিল, বলল, "ফ্লাইং ফক্স স্যার।" কাছে গিয়ে মরা জানোয়ারটির মুখ ভাল করে দেখে বুঝলাম 'ফক্স' কেন বলে। শুনলাম এর মাংস নাকি অতি উপাদেয়। ওরা স্রেফ পুড়িয়ে খায়।

জঙ্গল-পাহাড় অঞ্চলে ঝড়বৃষ্টি হলেই শীত পড়ে যেত। একদিন ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে খাদানের দিকে গিয়ে দেখি রেজা ও পুরুষ মজুর সবাই ঝুড়ি, শাবল, হাতুড়ি ফেলে মহা উল্লাসে উই ঢিবিগুলোর আশেপাশে ভিড় জমিয়েছে। কি যেন ধরে ধরে টপাটপ মুখে পুরছে। কাছে এগিয়ে দেখি মোটা মোটা তুলতুলে পোকাগুলোকে গর্ত থেকে বেরিয়ে উড়ে যাওয়ার অবসর পর্যন্ত দিচ্ছে না। পালক ধরে মুখে পুরে খেয়ে ফেলছে।

ওদের কাণ্ড দেখে ভীষণ অবাক হলাম। একটু বেলাতে অফিস-তাঁবুর কাছে কেশবাবুর সঙ্গে দেখা হতেই তাঁকে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা জানালাম।

কেশবাবু বললেন, "ওরা তো তবু পালক ছাড়িয়ে খায়, আমরা পালকও বাদ দিই না।"

"সে কি! আপনারাও খান নাকি এই পোকা?"

কেশবাবু তাঁর টেবিলের উপর থেকে নক্সা খুলতে খুলতে গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনিও তো খাবেন আজকে।"

একবার ভাবলাম ঠাট্টা। কিন্তু বয়সে বড় হলেও তিনি প্রথম থেকে আমাকে সমীহ করে চলেন, মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

বললেন, "সীরিয়াসলি বলছি, চলুন রান্নাঘরে দেখাচ্ছি।"

জঙ্গলের কাঠ পুড়িয়ে আমাদের উনুন জ্বলে। সেদিন ছিল বক্সীর রাঁধবার পালা। দেখি উনুনে মাংসের হাঁড়ি চাপিয়ে সে কোথায় বেরিয়েছে, আর সেই ছোট্ট পাতা-ছাওয়া ঘর ভরে গেছে অসংখ্য বাদলা পোকায়।

কেশবাবু বললেন, "দেখছেন, হাঁড়ির ওপরে ঢাকনা নেই! ইচ্ছে করে খুলে রেখে গেছে যাতে পোকায় হাঁড়ি ভরে যায়। তারপর হাতা দিয়ে এমন ঘেঁতলে দেবে যে খাওয়ার সময় টেরও পাবেন না। এতে নাকি ঝোলের স্বাদ বাড়বে।

বক্সী শুধু কোলদের ভাষা শেখেনি—দেখছেন ওদের অভ্যেসগুলোও রপ্ত করেছে !"

কথা শেষ হবার আগেই রাঁধুনী ঝড়ের মত এসে হাঁড়ির মুখে চট্ করে একটা ঢাকা চাপ দিয়ে বললে, "ওর কথায় বিশ্বাস করবেন না। একটু আগে দ্বিতীয়বার চা খেতে এসেছিল, দিইনি বলে আমার ওপর চটে আছে।"

বললাম, "আপনিই বা এত পোকার মাঝে হাঁড়ির মুখ খুলে যান কেন ?"

অশ্লীলতা-ঘেঁষা কথা বলার সুযোগ পেলে বক্সীর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রকাশ পেতো। বলল, "এত গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ায় প্রকৃতির দু-নম্বর ডাকটা বড় ঘন ঘন আসে তাই গাছের আড়ালে ছুটতে হয়। ডাকটা জোর এলে কি আর ঢাকাঢুকির কথা মনে থাকে স্যার ?"

বোসকে ঘটনাটা বলতেই প্রথমে সে বক্সীর ওপর মহা খাপ্পা হয়ে বলল, "আপনি ওকে ওরকম কথা বলতে দেবেন না। ওটা ওর রোগ। আস্কারা পেলেই বেড়ে যাবে। ও ভয় করতো ইউসুফ সাহেব আর কুমুদ সেন মশায়কে, এখন একমাত্র আপনাকে সমীহ করে কিন্তু এসব খারাপ কথা হজম করে গেলে ওকে আর সামলানো যাবে না।"

একটু পরে গম্ভীর হয়ে বলল, "কদিন ধরেই ওর কেশবাবুর সঙ্গে খিটিমিটি চলছে—সীতাহরণ পালা শুরু হওয়ার পর থেকে। আমরা তেমন শুনতে পাই না কিন্তু কাছাকাছি ওদের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। কেশবাবু নাকি বলেছিলেন, 'একঘেয়ে সীতার প্যানপ্যানানি তো আর সহ্য হয় না। পালার মধ্যে রাম, রাবণ, গরুড়, হনুমান, আর কারো কি কোন পার্ট নেই' ?

উত্তরে বক্সী বলে—'পালাটা হচ্ছে সীতা-হরণ ! রাম বা রাবণ হরণ নয়' !

"এই নিয়ে দুজনের তর্ক বাধে। শেষে কেশবাবু নাকি বক্সীর মেয়েলী পালাকে কটাক্ষ করে একটা খারাপ কথা বলেন।"

"কি খারাপ কথা ?"

বোসের গৌরবর্ণ মুখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে। আমি উত্তরের অপেক্ষায় স্থিরভাবে তাকিয়ে আছি দেখে চোখ নামিয়ে বলল, "বলেছেন নপুংসক।"

"মানে ? সংস্কৃত কথা বলে মনে হচ্ছে যেন—কথাটা যেন কোথায় শুনেছি ?"

বাংলা ভাষার পুঁজি আমার বেশী নয়।

ছেলেবেলায় দিদির বিয়ে উপলক্ষে আফ্রিকা থেকে ক'মাসের জন্য আমরা কলকাতায় আসি। তখন আমার দুই মামা—মন্মথমোহন বসু ও মনোজমোহন বসুর

উত্তর কলকাতার থিয়েটার মহলে বিশেষ প্রতিপত্তি। বাগবাজারের মদনমোহন-তলার রাসমঞ্চের পাশেই ছিল মামার বাড়ি। উক্ত মামাদের একজন ছিলেন স্কটিশচার্চ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরে কলেজের অধ্যাপক হন এবং আর একজন ছিলেন পুলিস কোর্টের উকিল। মেজমামা মন্মথমোহন পেশাদারী ও শখের রঙ্গমঞ্চে নাট্যকলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। সেজমামা মনোজ 'রেশমী রুমাল' 'রূপকথা' ইত্যাদি প্রহসন রচনা করে মঞ্চস্থ করান। সেই সুবাদে তাঁর পরিবারবর্গকে পেশাদারী অভিনয় দেখাবার পাস পেতেন। মা-দিদিদের সঙ্গে থিয়েটারে গিয়ে আমি কিছু কিছু সাধু ভাষা শিখে গিছলাম। কথার ঠিক ঠিক মানে না বুঝলেও, শব্দের ঝঙ্কার মনের কোথাও থিতিয়ে থাকতো।

আর একবার সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলার সঙ্গে পরিচয় হয় যখন নাইরোবি শহরে বাবার আকস্মিক হার্টফেল করে মৃত্যু ঘটে। মা শোকে, দুঃখে, দুর্ভাবনায় এমন কাতর হয়ে পড়েন যে ছোট ছোট তিনটি সন্তানকে একরকম বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে শয্যা নিয়েছিলেন। শিশুদের মধ্যে আমি ছিলাম বড়। টাকাকড়ি কুড়িয়ে-বাড়িয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করে তাঁকে দেশে পাঠাতে যে ক'মাস দেরি হয়, তার মধ্যে দেড়শ মাইল দূর থেকে একজন বাঙালী ব্রাহ্মণের ছেলে এসে তাঁকে কয়েক-দিন ধরে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পাঠ করে শোনায়। তখনও অনেক নতুন নতুন কথা শুনি।

তারপর মা আমাকে আফ্রিকাতে রেখেই চলে আসেন ছোট ভাই-বোনকে সঙ্গে নিয়ে। আমার মাতৃভাষার সঙ্গে সংস্রব তখনই শেষ হয়।

অল্প কিছুদিন—কয়েক মাস মাত্র, স্কুলে গুজরাটী ও পাঞ্জাবী শিক্ষকদের কাছে পড়ে চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই চাকুরিতে ঢুকি।

অবসর সময় কাটে খেলার মাঠে আর দু'একজন অবাঙালী সাংবাদিককে সাহায্য করে।

তারপর তো সরাসরি এই জঙ্গলে আসা।

যাই হোক, বোসের কাছে কোন উত্তর না পেয়ে সোজা বক্সীকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেশবাবু নপুংসক বলেছেন—সেটা এমন কি খারাপ কথা?"

উত্তর পেলাম, "ও ব্যাটা অত শক্ত কথা জানবে কোত্থেকে? বলেছে ক্লীব; তা বলুক গে, আমার যে পার্ট ইচ্ছে তাই করবো—তাতে ওর কি?"

এই ধরনের অনেক উটকো কথা আমি শুনতাম যার মানে পরে জেনেছি। অশোভন হলে বোস কিছুতেই বুঝিয়ে দিতে চাইতো না। তখনকার মস্ত

ডায়রীতে টুকে রাখতাম।

কিন্তু অশ্লীল চটুল কথায় বক্সীকেও হারিয়ে দিলেন নতুন কেমিস্ট বি.কে. জি.। পুরো নামটা নাই বা বললাম।

কয়েকদিন সহ্য করে বোস এবং ক্যাম্পবাসীদের অনেকে আমায় চেপে ধরলো এই উপদ্রবের একটা বিহিত করতে হবে।

লোকটি বক্সীরই সমবয়সী। খাওয়ার সময় দুজনে একত্র হলেই পরস্পরের উৎকট রসিকতার আদান-প্রদান হতো।

মনে হয় বোসের মত লাজুক ও সুরুচিসম্পন্ন লোকদের খেপিয়ে মজা দেখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আমি বড় একটা গ্রাহ্য করতাম না।

একদিন কিন্তু তাদের রসনার বন্যা একটু বেশিরকম আল্গা হওয়াতে বাধ্য হয়ে জানালাম যে, তাদের এবার থেকে আলাদা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

নবাগত রাসায়নিক তখনকার মত ভব্য হলো। কিন্তু দুদিন পর থেকেই আবার ধরলো এক নতুন কায়দা। বর্ণমালা অদলবদল করে আর একমাত্র বেশি অশ্লীলতা—যেমন 'ব' জায়গায় বসতো 'গ' বা 'গ' জায়গায় 'ব'। সাংকেতিক ভাষা প্রয়োগে আপত্তি করা চলে না। বেচারা বোস তাই বড়ই আঁতান্তরে পড়লো।

ওদের কথা চাপা দিতে তখন আমি খাবার সময় আমার আফ্রিকার বাল্য-জীবনের গল্প বলা শুরু করলাম।

আমার ছোটবেলায় দেখা পূর্ব-আফ্রিকা। স্ট্যানলি, লিভিংস্টোন, স্পীক প্রভৃতি পর্যটকেরা যা বর্ণনা দিয়েছিলেন, তখনও তার বিশেষ কোন বদল হয়নি। সাড়ে পাঁচ হাজার ফুটের বেশি উঁচু একটি প্রশস্ত মালভূমির উপরে ছোট্ট রেল পল্লী, সরকারী দপ্তর, আদালত, হাসপাতাল ও কয়েকটি আলোঝলকিত দোকানঘর নিয়ে সুরম্য নগরী নাইরোবি সবেমাত্র গড়ে উঠেছে। ঘরবাড়িগুলি কাঠের তৈরি। নীল ও সবুজ বর্ণের টিনের আচ্ছাদন প্রকাণ্ড গাছপালার সঙ্গে মিশে গেছে। আলাদা করে চোখে পড়ে পাথরের তৈরি একটি দুটি ব্যাঙ্ক ও একটি হোটেল। রাস্তাগুলি ঋজু-ঋজু। তিনজোড়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত শিশুচক্ষু ঝিলমিলের আড়াল থেকে দেখে মাসাই, কিকুয়ু, নান্দি প্রভৃতি উপজাতির মোড়লদের সশস্ত্র সাঙ্গোপাঙ্গসহ শোভাযাত্রা। তারা বিভিন্ন ধরনের পোশাক ও ঢাল-বল্লম অথবা তীর-ধনুক ও লাঠি নিয়ে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে জমি-জমা, জল ও গোচারণের স্বত্ব নিয়ে দরবার করতে যেত এই পথে। শিশুরা

আরও দেখে বল্কল অথবা পশুচর্মের বস্ত্রে ভূষিতা গ্রামবাসী মেয়েদের দল। কিকুয়ু রমণীর মুণ্ডিত মাথায় ভারবহনের জন্যে চামড়ার ফালি ও তার সঙ্গে সংলগ্ন পিঠের ওপর জ্বালানি কাঠের বোঝা, ও থলির মধ্যে ঘুমন্ত শিশু। দুই কানে ও হাতেপায়ে ভারী ভারী ধাতুনির্মিত অলঙ্কার।

তিনঘর মাত্র বাঙালীর বাস। তাও দূরে দূরে। সুন্দর সুন্দর বাগানে ঘেরা কাঠের বাড়িগুলি চৌকো চৌকো পাথরের থামের ওপর বসানো। তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকা যায়। খালি বাড়ি পড়ে থাকলে নিচে জন্তু-জানোয়াররা বাসা বাঁধে। আমি যখন কোলে তখন বাসাবদল করে ঘোষ-পরিবারের নাকি বিপদ ঘটে। আসবাবপত্র নাড়ানাড়ির সময় বাড়ির তলা থেকে একজোড়া সিংহশাবক বেরিয়ে আসে। সেগুলিকে চিড়িয়াখানায় স্থানান্তরিত করবার পর সিংহিনী এসে নাকি বেজায় তর্জন-গর্জন করে সারারাত। মা আমাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন।

বিষুবরেখার প্রায় উপরে থাকার ফলে নাইরোবিতে সূর্যোদয় হতো হঠাৎ বিস্ফোরণের মত। চারদিক আলোয় আলো হয়ে যেত। আর অস্ত যেত ঝপ করে। তখন পশ্চিমের পাহাড়পুঞ্জ থেকে পূবের নদী উপত্যকা সব জড়িয়ে একটা ঘন কালো ছায়া ছোট্ট লোকালয়টিকে ঘিরে এগিয়ে আসতো। আমাদের শিশুমনের ধারণা ছিল ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে যত রাজ্যের হায়না, সিংহ ও গণ্ডার বুঝি আমাদের বাড়িঘর ঘিরে ফেলছে, তলায় ঢুকছে।

অনেক ভয়াবহ গল্পও শুনতাম। মাঝে কিছুদিন ধরে আকাশে ধূমকেতু উঠলো। বাবার হাত ধরে অবাক হয়ে দেখতাম। বড়রা কেউ কেউ বলতেন, ঐ ঝাঁটার মত লেজটা আরও কাছে এলে পৃথিবীটাকে পুড়িয়ে দেবে।

সন্ধ্যে হতেই মা ও দিদি আমাদের বাড়ির কাঠের চৌকাঠে চৌকাঠে দেশ থেকে আনা গঙ্গামাটি-ছোঁয়ানো জলের ছিটা দিতেন, শাঁখ বাজতো। বিদেশ-বিভুঁয়ে স্বামীপুত্রের কল্যাণ-কামনায় মা তাঁর দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাংলা দেশের যাবতীয় বারব্রত পালন করতেন।

বক্সী, কেমিস্ট বি. কে. জি. এবং আর সকলে নিবিষ্ট হয়ে শুনতো আমার গল্প। দেখতাম আফ্রিকার কাহিনীর চেয়ে তারা আমার মা-বোনের গল্পেই বেশি আকৃষ্ট হতো। বুঝতাম মনে মনে, সবাই তাদের নিজের নিজের ছেলেবেলার কথা ভাবছে।

এর পর থেকে খারাপ কথা বলার ঝোঁক কমে যায়।

কলকাতা থেকে বিশিষ্ট পরিদর্শকেরা এলে ম্যানেজার সাহেব অনেক সময় খাঁচায় ভরে বহুরূপী আর জঙ্গলী ময়না পাখি উপহার দিতেন। এই দুই প্রাণীই ওখানে অপর্যাপ্ত পাওয়া যেত। খোঁজাখুঁজি করতে দূরে যেতে হতো না।

হেড অফিসের গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর জাওয়েট সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনতাম। আমি আসবার বেশ কিছুদিন আগেই তিনি কাজ ছেড়ে দিয়ে বিলেতে ফিরে যান, কিন্তু তখনও তাঁর প্রভাব সকল কিছু উদ্যমের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেতো। কুমুদ সেন বোসকে বলতেন যে, তিনি সরকারী কৃষি বিভাগের কাজ ছেড়ে যখন বাণিজ্য সংস্থায় যোগ দেন তখন এই লোকটির ব্যক্তিত্ব তাঁকে মুগ্ধ করে। ইউসুফ বলতেন, জাওয়েট থাকলে তিনি এ কোম্পানির কাজ নাকি ছাড়তেন না। শুনতাম এঁর গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী ও ধাতব পাথর সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল নিবিড় ও ব্যাপক। আরও বিস্ময়কর ছিল অনুসন্ধিৎসার নিষ্ঠা। সব কিছুর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে নাকি মজার মজার বিপর্যয় ঘটে যেত। হয়ত নিবিষ্ট হয়ে বসে কাঠি ফড়িং-এর আত্মগোপনের কৌশলগুলো আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছেন, ইত্যবসরে হাট থেকে কিনে আনা ভাল্লুকবাচ্ছাগুলো বহু আয়াসে তৈরি খাঁচার তলায় সুড়ঙ্গ কেটে গা-ঢাকা দিল। একবার কতকগুলো ময়ূরবাচ্চা নিয়ে গিয়ে কলকাতার বাড়িতে তোলেন। মনে ছিল না যে, এই পাখিগুলো দেখতে যেমন সুন্দর, একটু বড় হলে বোলটা হয়ে ওঠে তেমনি কর্কশ। পাড়ার মেমসাহেবদের দিবানিদ্রার ব্যাঘাত হতে নালিশ ও আবেদন আসতে লাগলো কিন্তু তখন হয়ত শিখী শাবকের আহার ও নিদ্রা সম্বন্ধে গবেষণা চলেছে সুতরাং কোন অভিযোগই গ্রাহ্য হলো না। তারপর কোম্পানির কাজে সফরে যেতে হলো। ফিরে এসে দেখেন খাঁচা শূন্য।

সঙ্গে সঙ্গে তিন প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ এসে গেলো। মেনুতে দেখেন পাখির মাংস। এসব অবশ্য শোনা গল্প।

আমার সময়ে পালা করে আসতেন এড্‌মাণ্ড্‌সন স্পেন্সার ও হেনরী ডে। এঁদের মধ্যে বনিবনা ছিল না বলে বড় একটা একসঙ্গে দেখা যেত না। স্পেন্সার ছিলেন ল্যাঙ্কাসায়ার-এর এক দরিদ্র দোকানদারের পুত্র। অল্পবয়সে এক বয়নশিল্পের কারখানায় সামান্য বেতনের মজুরের কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন।

তার পর 'নাইট স্কুলে' অধ্যয়নকালে জাতীয় বৃত্তি পেয়ে রয়াল স্কুল অফ মাইন্স-এ শিক্ষালাভ করে পারদর্শী হয়ে ওঠেন ধাতুবিদ্যায়। হেনরী ডে সরাসরি ভূবিদ্যায় ডিগ্রী নিয়ে সেই কাজেই বহাল হন।

কেমন করে কোন্ কারণে পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয় সেকথা বোধ করি ইউস্লুক নিজেই জানত না। বোসকে বলে, "কেবল এ ব্যাটারা কেন, এমন কোন দুজন সাদা চামড়ার লোক দেখলাম না যারা একসঙ্গে এক ক্যাম্পে ঝগড়া না করে থাকতে পেরেছে। দুদিন যেতে না যেতেই মন-কষাকষি শুরু হয়ে যায় সামান্য সামান্য কারণে। দুজন মেমসাহেবকে এক ক্যাম্পে থাকতে এলে পরস্পরের নিন্দাবাদ শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়। একটুও উদারতা নেই মনের।

বোস পরচর্চা করে না। কথা বলতো বক্সী বেশ রসিয়ে রসিয়ে।

আমরা উপস্থিত থাকলে বহুরূপীরা বড় একটা ঘরে ঢুকতো না কিন্তু মনে হতো যেন মানুষের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করতো। ঘর থেকে বেরিয়েই কয়েকটি বহুরূপীকে নিত্য দেখতাম গাছের ডাল বা পাথরের উপর স্থির হয়ে যেন ধ্যান করছে। তারপর হঠাৎ অকারণে এমনভাবে মাথা নাড়তে শুরু করতো যেন কতই একটা কোন কঠিন সমস্যার সমাধান করে ফেলল। আমাদের গতিবিধির উপর একটা চোখ নিবদ্ধ থাকতো। মতলব সম্বন্ধে সন্দেহ হলেই গায়ের রঙ পালটানো শুরু হতো। নাগালের বাইরে সরে পড়তো।

স্পেন্সার সফরে এসে কাছাকাছি কোথাও ক্যাম্প করে থাকলে ওরা হয়ত ত্রস্ত হয়ে থাকতো, কারণ একসময়ে বহুরূপী ধরা ওঁর বাতিককে দাঁড়িয়ে গিছলো।

বোসকেই বলতে শুনলাম, "কে জানে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে কি করে? যা কঞ্জুস—নিশ্চয় বিক্রি করে। কিন্তু কেনে কে?"

শহরের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা নতুন কেমিস্ট-এর মনে পীড়া দিত। সে বলতো বক্সী মফস্বলবাসী হলেও আমাদের চেয়ে অনিক বেশি জানে শোনে। যাত্রার দলে থেকে ঘুরে বেড়ালে অনেক জ্ঞানগম্যি বাড়ে। উপস্থিত একটু বিজ্ঞের মত হেসে সে বলল, "যারা বেড়াল-কুকুরের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ করে সেই সব বেশ্যারাই তো এই সব বিকট বিকট জীবজন্তু কিনে খাঁচায় ভরে রাখে। ওদের অঢেল অবসর—"

বোসের মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল। একবার আমার মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে নিয়ে লোকটিকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "থাক্, বলতে হবে না।"

গিরগিটি জাতীয় আর একরকম জীবের প্রাদুর্ভাব হতো মাঝে মাঝে। লেজ শরীরের অনুপাতে অত্যধিক লম্বা ও সরু। এরা বহুরূপীর চেয়ে চনমনে কিন্তু টিক্‌টিকির মত নির্লজ্জ উদরপরায়ণ নয়। মানুষের সঙ্গ পরিহার করে চলে।

ইউসুফের নমুনা-সংগ্রাহকদের মধ্যে একজন ছিল ঘাসিরাম—জাতিতে কোল কিংবা মুণ্ডা হবে। শুনতাম ও ছেলেবেলা থেকে পোকামাকড়দের সঙ্গে রীতিমত দোস্তি পাতিয়ে ফেলেছিল। ওদের হাবভাব দেখে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারতো বলে কেশবাবু ওর সঙ্গে পরামর্শ করে ঘুরে ঘুরে জরিপের কাজে যেতেন। সেইজন্যে তাঁকে বড় একটা সংকটে পড়তে হতো না।

বক্সী তাচ্ছিল্যভরে বলতো, "গাঁজা।" কিন্তু ঘাসিরামকে সমীহ করে চলতো।

নালার জলে লোহা মেশানো থাকায় আমরা সকলেই অল্পবিস্তর কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগতাম। অবশ্য খিদের কোন ব্যতিক্রম হতো না। সময় নষ্টের জন্যে দুঃখ ছিল না। ভোর না হতে হতে সূর্যোদয়ের আগেই জঙ্গলের মধ্যে মনোরম কোন জায়গা বেছে নিয়ে দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতাম। কখনো হাত বাড়িয়ে জঙ্গলী শসা কিংবা আমলকী পেড়ে নিয়ে মুখে পুরতাম। হর্তুকী কুড়িয়ে তাই দিয়ে কাল্পনিক কেল্লার দেওয়াল খাড়া করতাম। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাকড়সার জালে দেখতাম হীরকখণ্ডের মত ঝলমল করছে শিশিরবিন্দু। গাছের ফাঁক দিয়ে গোলাপী আভা এসে প্রত্যেকটি বিন্দুর উপর প্রতিফলিত হচ্ছে। ক্রমশঃ বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি আর ভ্রমরেরা জঙ্গলী ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াতো। প্রজাপতি আসত বিচিত্র রঙের ডানা উড়িয়ে।

অবশ্য এসব ভাল করে দেখবার অবসর মিলতো বুধবার হাটের দিনে। কাজে যাওয়ার তাগিদ না থাকায় অনেক কিছু চোখে পড়তো। কত জীবনের সমাগম, কত লতাপাতা ও জঙ্গলী ফুলের বৈচিত্র্য!

সব চেয়ে বিস্ময়কর মনে হতো গুবরে পোকাদের কাণ্ড। প্রতিদিন প্রাকৃতিক কার্য সেরে ওঠবার সময় নজরে পড়তো ইতিমধ্যেই সমস্ত ময়লা বড় বড় গোল ডেলা বানিয়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এক-একটি ধূসর বর্ণের কীট নিজেদের চতুর্গুণ ওজন ও আকারের বোঝা অনায়াসে অসমতল বন্ধুর জমির উপর দিয়ে নিয়ে চলেছে—কোথায় কোন্ রসদখানায় কে জানে! বর্ষার তখন অনেক দেরি, তবে তাদের খাদ্য-সঞ্চয়ের এত তাড়া কেন?

এ প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি বোস। বরং সে উল্টে আরও একটা প্রশ্ন করে বসে, "আমি তো রোজ জায়গা বদলাই কিন্তু ওরা

কেমন করে আগে থাকতে টের পেয়ে উড়ে এসে জুটে যায়! বিনা পয়সায় মেথর মন্দ নয়।"

ইউসুফ ওকে বলেছিল যে এই দেখেই মানুষ নাকি প্রথমে চাকার গাড়ি বানাতে শেখে।

ম্যাঙ্গানিজের 'সি' খাদানের কাছে, নালার অন্য পারে, গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা ঝর্ণা ছিল। সেদিকে বড় জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে শিকারীরাও বড় একটা ঘেঁষতে চাইতো না। একবার এক সরু জলের ধারা অনুসরণ করে অনেকখানি চলে যাই। এক জায়গায় দেখলাম জলের ধারা প্রায় শুকিয়ে এসেছে গ্রীষ্মের খরায়, কিন্তু নালা-গর্ত বেশ প্রশস্ত আর তার রঙ বেগুনী ও গাঢ় নীল মিলিয়ে অদ্ভুত উজ্জ্বল। কৌতূহলী হয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি অসংখ্য ছোট ছোট একই রঙের প্রজাপতি ভিজা মাটির উপর গায়ে গায়ে বসে কি যেন শুষে খাচ্ছে। মনে হলো কিছু খেয়ে মাতাল—বিহ্বল হয়ে পড়েছে। হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম, নড়তে চাইল না!

বোসকে বলতে সে বলল, "ইউসুফ সাহেব কিংবা কুমুদ সেন থাকলে হয়ত মাটি পরীক্ষা করে বলে দিতে পারতেন। কে জানে হয়ত ম্যাঙ্গানিজ খেয়ে-খেয়েই ওদের রঙ ঐ রকম হয়েছে!"

কুমুদ সেন-এর কথা উঠলে বোস শতমুখ হয়ে উঠতো তাঁর প্রশংসায়।

বোস বলল, "গতবার এসে সেন সাহেব তাঁবুতে থাকেননি। আমাদের মত একটা ডালপালার ঘর বানিয়ে নিয়েছিলেন, তবে ছাদটা ছিল সরু সরু করে চেরা কাঠের ওপর পাতার ছাউনি। একদিন দুপুরে সবেমাত্র এখান থেকে খেয়ে গিয়ে মাচার ওপর উঠে চোখ বুজেছেন, এমন সময় ছাদ থেকে একটা প্রকাণ্ড বিষধর সাপ ওঁর বিছানায় পড়ে বুকের ওপর দিয়ে কিলবিল করে চলে যায়। তখন তিনি জেগে। কিন্তু একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে বলেন, আহা, বেচারারা বড় নার্ভাস প্রাণী।"

আমি এগিয়ে দিতে গিয়ে একটু বসেছিলাম। অনেকক্ষণ কাঠ হয়ে বসে থেকে বলি, "সত্যিকার নার্ভাস প্রাণী হচ্ছে আমার মত সাধারণ মানুষ।"

॥ ১২ ॥

বোস বিনয় করে যাই বলে থাকুক না কেন, ওর আদপেই ভয়-তরাস ছিল না।

মানুষের চেহারা দেখে তার স্নায়বিক শক্তি আঁচ করা যায় না। নায়ারকে আমরা সাবধানী আর মাথা-ঠাণ্ডা লোক বলে জানতাম। একদিন সে নার্ভাস হয়ে লাল পিঁপড়ের বাসা ভেঙে ফেলে বড় আতান্তরে পড়েছিল। সেই সঙ্গে আমারও একটা বড় গোছের ফাঁড়া কাটে।

বোস তখন রিপোর্ট টাইপ করার কাজে খুব ব্যস্ত। এদিকে দিন বড় হওয়ার পর থেকে আমিও কাজের শেষে বেড়াতে যাওয়ার দূরত্ব একটু একটু করে বাড়িয়ে চলেছি। কোনও অস্ত্র সঙ্গে নিতাম না। খেয়াল থাকতো ক্যাম্পে ফিরতে যাতে অন্ধকার না হয়ে যায়। উলিব্রু পাহাড়ের তলে তলে বড় নালাটা অনুসরণ করতাম, তাই হারিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল না। গল্প করতে করতে গেলে জন্তু-জানোয়ার বড় একটা সামনাসামনি আসতো না। কাজ থাকলে বোস আর কাউকে সঙ্গী জুটিয়ে দিত। সে ছাড়া একমাত্র নায়ারই আমার সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে পিছপাও হতো না।

সেদিন আমরা নালা অনুসরণ করলাম উল্টো দিক দিয়ে। শুনেছিলাম নতুন কোন খাদান খোলা হবে তাই ওদিকে গাছ কাটা হচ্ছে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সেই জায়গায় এসে পড়ে নায়ারকে দাঁড় করিয়ে রেখে মনের আনন্দে খানিকটা ছুটোছুটি করে নিলাম। এতদিন গাছপালার মধ্যে বন্ধ হয়ে থেকে মনের মত করে হাত-পা নাড়তে পাইনি।

নায়ারকে বললাম, "দেখবে এখান থেকে একলাফে নালাটা পার হতে পারি!"

সে বলল, "অসম্ভব। খানিকটা ছুটে এসে তবে তো লাফাতে হবে।"

তার কথা শেষ হবার আগেই লাফ দিলাম। একটা পা কাদাজলে পড়লেও পার হয়ে গেলাম, দেখলাম সেখান থেকে লাফ দিয়ে ফেরা যাবে না, কারণ ওদিকটা ধারালো পাথর দিয়ে ঠাসা। নায়ারকে আর সেকথা জানালাম না। তাকে বললাম, "আমি নালার এপারটা ধরে হাঁটি আর তুমি ওদিক দিয়ে এগিয়ে চল।"

আমার খামখেয়ালী স্বভাবের পরিচয় নায়ার জানে, কাজেই কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।

নালার ধারে ঝোপঝাড়গুলো ক্রমশঃ বাড়ছিল। আর পরস্পরকে দেখতে

পাচ্ছিলাম না। তখন কথা হচ্ছিল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। একটু পরে দেখলাম ঘাসের মাঝে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে কাদা। কেশবাবু বলতেন, জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কাদাজল দেখলে তাঁর লোকজনেরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। জানোয়াররা নাকি জল খেয়ে এসে এই সব জায়গায় গড়িয়ে নেয়। আমি সচকিতে চারিদিকটা একবার দেখে নিচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়লো বেশ কিছুদূরে একটা গাছের নিচে একটা বাইসন দাঁড়িয়ে আমায় দেখছে। কি বিরাট তার মাথা! ভাবছি পা টিপে টিপে পিছন দিকে হেঁটে লুকিয়ে পড়ি, কিন্তু ভরসা হলো না, পরমুহূর্তে দেখি সে ঘাড় নিচু করে মাটিতে পা ঠুকতে শুরু করেছে। চোখ হিংস্র হয়ে উঠেছে—অর্থাৎ আক্রমণ করবে।

চিৎকার করে নায়ারকে উদ্দেশ করে বললাম, "সাবধান, বাইসন!"

সামনের দিকে একটিমাত্র উঁচু গাছ দেখলাম নালার ধারে, নাগালের মধ্যে। কেন্দু গাছ, বেশি মোটা নয়, তবে শক্ত। সেটা লক্ষ্য করে চোখ-কান বুজে ছুটে গিয়ে উঠে পড়লাম গুঁড়ি বেয়ে বেশ খানিকটা। আমার ভারে গাছটা জলের গভীর খাতের দিকটায় ঝুঁকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড আঘাত এসে গাছের গুঁড়িতে লাগলো। আমি কোনক্রমে একটা ডাল আঁকড়ে ঝুলে রইলাম। আবার ধাক্কা। গাছটা দুলতে লাগলো কিন্তু ভাঙলো না।

নালাটা এইখানে বাঁক নিয়েছে। ওপারটা খাড়া হয়ে উঠে পাহাড়ে মিশেছে। ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে কিছুই দেখা যায় না, তবে নায়ার-এর গলার আওয়াজ পাচ্ছি খুব কাছ থেকে। উত্তেজিত হয়ে কি বলছে বুঝতে পারলাম না। গাছে ঝুলতে ঝুলতে বললাম, "এই যে আমি, গাছে!" উত্তরে কি একটা যেন বললে তাও ধরতে পারলাম না।

নিচের দিকে দেখতে সাহস হচ্ছে না। হাতি হলে এতক্ষণে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে থেঁতলে ফেলতো, কিন্তু বাইসনটা নাগাল পাবে না। হয়ত নায়ার-এর কণ্ঠস্বর শুনে আমার কথা ভুলে গেছে। যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে থাকবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু এবার আচমকা ধাক্কার বদলে গাছটা চড়চড় করে আওয়াজ করে দুলতে লাগলো। ভয় হলো এবার বুঝি গাছটা উপড়ে পড়বে। ঠিক সেই সময় নায়ারকে দেখতে পেলাম। দেখি নালার ওপারে সামনে লাফাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে আর গা চাপড়াচ্ছে। কৌপীনের মত ছোট্ট একটা অধোবাস ছাড়া তার পরনে কিছুই নেই।

এদিকে গাছটা আরও দুলছে। এক মুহূর্ত ভাবলাম, ভূমিকম্প হচ্ছে নাকি?

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি বিরাট পশু গাছের গুঁড়ির ওপর শুয়ে পড়ে ঠেলাঠেলি করছে।

নায়ারকে চেঁচিয়ে বললাম, "দেখছ কি! পাথর ছোঁড়—এখানে ও নালা পার হয়ে তোমার দিকে যেতে পারবে না।"

সে এতক্ষণ বাইসনটাকে দেখেনি। এইবার দৃষ্টি পড়তে মুখচোখের ভাব গেল বদলে। পাগলের মতো চিৎকার করে বলল, "জাম্প, জাম্প এ্যাটওয়ান্স,—ক্লিয়ার অফ দি রক্স্! ও গাছ ভাঙছে।"

জলের মধ্যে ধারালো পাথর দেখে লাফাতে ইতস্তত করছিলাম এতক্ষণ। এবার মরীয়া হয়ে যতদূর সম্ভব পাথর এড়িয়ে লাফালাম। একটা হাতের কব্জির কাছে ভীষণ লাগলো। অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিতে নায়ার আমায় টেনে তুললো।

আমরা পিছনের দিকে না তাকিয়ে কোনরকমে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে সেই খাড়া পাহাড়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত উঠে অবসন্ন হয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে বসে পড়লাম। সেখান থেকে নালা দেখা যায় না।

এবার নায়ার-এর দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখবার ফুরসৎ হলো। ভেবেছিলাম আমার ডাকে কাঁটাঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটে আসবার সময় জামাকাপড় আটকে যেতে সেগুলো সে খুলে ফেলেছে, ছট্‌ফট করছিল আঁচড়ের জ্বলুনিতে, দেখি তার হাত, পা, বুক, পেট, মুখ দাগা-দাগা হয়ে ফুলে উঠেছে। এ তো কাঁটার আঁচড় নয়।

বললাম, "কি ব্যাপার, জামাকাপড় কি হলো?"

সে এতক্ষণ বাইসনের ভয়ে নিজের অবস্থার কথা ভুলেছিল। একটা বড় শাল গাছ দেখিয়ে কাতর কণ্ঠে বলল, "ওর তলায় ছেড়ে এসেছি—ওরে বাপ রে!" আবার সে তিড়বিড় করে লাফাতে লাগলো।

গাছতলায় গিয়ে দেখলাম ছাড়া জামাকাপড়ে থিকথিক করছে বড় বড় লাল পিঁপড়ে। দুটো বড় ডাল ভেঙে, সেগুলোকে পিটে পিটে ছাড়ালাম। একটু ধাতস্থ হয়ে নায়ার বললে, "যেই শুনলাম বাইসন অমনি আপনাকে দেখবার জন্যে গাছে উঠে পড়লাম। তারপর শুনলাম তাড়া করার আওয়াজ, তখন মগডালে উঠতে গেছি—হঠাৎ সারা গা-টা লাল পিঁপড়েতে ভরে গেল। কামড়ের জ্বালায় গাছ থেকে গেলাম পড়ে। জামাকাপড় ছেড়ে গা থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে ছাড়াতে ছুটেছিলাম। এমন জোর কামড়ায় যে মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেললেও ছাড়ছে না।"

উপর দিকে তাকিয়ে দেখি পাতা যোড়া যোড়া পিঁপড়ের বাসা, সমস্ত গুঁড়িটা পিঁপড়েতে ভরে গেছে।

নায়ার প্যান্ট-শার্ট পরে ভব্য হওয়ার পর আমরা ক্যাম্পের দিকে রওনা হলাম। এত যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে দুর্ভোগের কমিক্ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বলল, আজকের এই ঘটনা সম্বন্ধে কাউকে কিছু না বললেই ভাল হয়।"

বললাম, "জঙ্গলে বাস করতে হলে এইরকম দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে—তাতে লজ্জার কি আছে? তা ছাড়া আপনি তো সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, আমি হলে তো এক ছুটে ক্যাম্পে ফিরে মাচায় উঠতাম।"

নায়ার বাংলা ভাষা জানে না। কথা হচ্ছিল ইংরিজিতে। বলল, "কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেলার কথাটা না হয় বাদ দেবেন।" তারপর সে সেই বিকটাকার বাইসন-এর কথা তুললো, "বাব্বা, কি প্রকাণ্ড মাথা—ডিড্ ইয়ু নোটিস্! জলে গা ভিজিয়ে গুঁড়ির ওপর ঘষছিল—হাও কানিং!"

কেশবাবুর কাছে পোকামাকড়ের টোটকা ওষুধ থাকতো। নায়ারকে ওঁর তাঁবুতে নিয়ে গেলাম। বক্সী উপস্থিত ছিল। সে আমাদের এ্যাড্ভেঞ্চারের গল্প শুনে বলল, "হ্যাঁ, আপনাকে স্পট্ করবে বলেই গাছে উঠেছিল বটে ঐ বপু নিয়ে। তাহলে আর ভাবনা ছিল না। নিজের প্রাণ বাঁচাতে গাছে উঠেছিল—একটু জেরা করলেই সত্যি কথা জানা যাবে।"

নায়ার সর্বাঙ্গে ওষুধ লাগিয়ে বক্সীর কথার কোন প্রতিবাদ না করেই চলে গেল।

ততক্ষণে আমার কব্জির কাছটা ফুলে ঢোল হয়ে উঠে কনকনানি শুরু হয়েছে।

এ নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না।

॥ ১৩ ॥

বোসের মেজদা বঙ্কিমবাবু সপ্তাহে একবার কিংবা মাসে তিনবার চাইবাসা থেকে টাকা নিয়ে আসতেন। তিনি কোলহান অঞ্চলে এক ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর খুব বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। কোম্পানির শ্রমিক ও ঠিকাদারদের নিয়মিতভাবে প্রতি মঙ্গলবার যে টাকা ও রেজকি দিতে হতো—তার ভারি ভারি থলিগুলোকে

আমাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া ছিল তার কাজ। তখনকার দিনে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আসা-যাওয়া করা ছিল রীতিমত বিপজ্জনক ব্যাপার। তার ওপর ঐ টাকার থলি নিয়ে আসার দায়িত্ব! নোটের প্রচলন ছিল না। ঠিকাদারেরা পাঁচ-দশ টাকার নোটও নিতে চাইতেন না, কারণ কাছাকাছি কোথাও ভাঙাবার সুবিধে নেই। সে সময়ে আবার আধুলি আর পয়সার বেশ ওজন ছিল। তাই থলিগুলো দস্তুরমত ভারি হতো।

চাইবাসা থেকে হাট গামারিয়া পর্যন্ত ছিল পাকা রাস্তা। তারপর জগন্নাথপুর পর্যন্ত পথ খারাপ হলেও অসমতল ছিল না। মালিকের প্রাচীন ফোর্ড গাড়ি সেই অবধি যা হোক করে ঠিক পৌঁছে যেতো। সেখান থেকে জামদা পর্যন্ত পৌঁছতে কি অভিজ্ঞতা হতো জানতে পারতাম না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা গরুর গাড়ি যাতায়াতের পথ ছিল বটে, কিন্তু খাড়াই-উতরাই খোঁচা খোঁচা পাথর আর ধ্বসা মাটির গল্প শুনতাম ডাক-রানারদের কাছে। ওরা হিংস্র জানোয়ারদের চেয়ে ঐ পথকে বেশী অপছন্দ করতো আরও একটি কারণে, প্রস্পেক্টিং-এর প্রথম দিকে একজন ডাকপিওন খুন হয়েছিল কোন এক বড় গাছের তলায়—সেই থেকে অনেক রকম ভৌতিক গল্পও চালু হয়ে গিছল।

বঙ্কিমবাবু কিন্তু ঠিক পৌঁছে যেতেন সময়মত। সঙ্গে কোন আত্মরক্ষার হাতিয়ার—এমন কি মোটা লাঠিও নিতেন না। কিছুদিন পরে গাড়ি বিকল হলে কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি মালবাহী ট্রেনের গার্ডের কামরায় যাতায়াত শুরু করেন।

ততদিনে ডাকঘরও জগন্নাথপুর থেকে মহুদায় উঠে এসেছে।

ভদ্রলোকের চেহারা, হাবভাব, পোশাকপরিচ্ছেদ দেখে আমি তো অবাক। ফরসা গায়ের রঙ, ছোটখাটো আকার, অতি ভাল মানুষ। পরনে ধুতির ওপর শার্ট আর ছোট সাইজের সুতীর কোট। জীবনে কখনও হাতে অস্ত্র ধরেছেন বলে মনে হয় না। অথচ না আছে চোর-ডাকাতের ভয় আর না আছে জানোয়ার সম্বন্ধে কোন ত্রাস।

ঠিকাদারদের মধ্যে জগমল দোসা আর ভানু নানাজি আমার কাছে ওদের মনের কথা বলতো। ওদের ওপর দিয়ে আমি গুজরাটী ভাষা-চর্চা বজায় রেখেছিলাম। ওদের দেখতাম বেজায় মারোয়াড়ী-বিদ্বেষ, বলতো, "আফ্রিকার কোথাও ঐজাতীয় বেনিয়া দেখেছেন!"

স্বীকার করতে হতো যে দেখিনি। ওখানকার ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে ইসমাইলী

খোজা, বোরা, কাঠিয়াওয়াড়ী ও কচ্ছিদের একচেটিয়া। পার্শী, পাঞ্জাবী ও সিন্ধী ব্যবসাদারও কিছু কিছু দেখেছি বটে, কিন্তু কোন মাড়োয়ারীরই সাগর পেরিয়ে যাওয়ার উদ্যম হয়নি সেকথা সত্যি।

নিজেদের কপালে আঙুল ঠেকিয়ে ওরা বলতো, "এই মগজ জিনিসটাই তো ওদের নেই। প্রতিযোগিতায় পারবে কেন? ওরা দেখবে কোথায় জঙ্গলী ভাল-মানুষ আদিবাসীদের ঠকিয়ে ফাঁকতালে কিসে কিছু টাকা মেরে নেওয়া যায়। এই তো জঙ্গলে টাকা পাঠিয়ে কমিশন লুঠছে কিন্তু নিজেরা কখনও এসেছে? পাঠায় বোসবাবুর ঐ ভালমানুষ দাদাকে। ওদের ধারাই হচ্ছে এই—নিরীহ ভদ্রসন্তানদের খুঁজে বের করে, তাকে বাবু-বাছা বলে পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়ে কেমন গ্রাস করে নেয় দেখছেন তো?"

আমি শুনে যেতাম। ভারতবর্ষের এক প্রদেশের লোকেদের প্রতি আর এক প্রদেশের লোকের বিদ্বেষ দেখে অবাক হতাম। আফ্রিকার প্রবাসজীবনে পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, মালায়ালী, গোয়ানীজ, পার্শী, সিন্ধী ও বাঙালীর মধ্যে কোন তফাৎ আছে সে বোধটা পর্যন্ত ছিল না। এমন কি হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীশ্চান সকলেই একই সম্প্রদায়ভুক্ত বলে জানতাম।

কচ্ছি ঠিকাদারদের বলতে পারতাম যে জাতিনির্বিশেষে সকল ভারতীয় বেনিয়ার স্বভাবই এক। আফ্রিকাতেও তাই দেখে এসেছি।

এক্ষেত্রে প্রতিবাদ করলাম না, কারণটা বোসের কাছে শুনেছিলাম যে ওর মেজদাকে ভালমানুষ পেয়ে মালিকেরা নির্মমভাবে খাটিয়ে নিচ্ছে উদয়াস্ত। প্রতিদিন নাকি নিজেদের সাদাসিধা নিরামিষ পুরি-তরকারী খাওয়ায় আর বলে, "আরে মশায়, আপনি কি আমাদের পর নাকি? আপনার ছেলেপিলেদের নামকরণ বা বিয়ের সময় হোক তখন তো আমরাই গিয়ে দাঁড়াব—অবশ্য হাতখরচ হিসাবে কিছু টাকা নেবেন বৈকি।"

বঙ্কিমবাবু নিজে কখনও আমাদের কাছে তাঁর মালিকদের নামে অভিযোগ বা নিন্দা করেননি। তিনি সে-প্রকৃতির লোকই ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব জীবন কিছু ছিল বলে মনে হতো না। তাঁকে নাকি ভোর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মালিকের গদিতে আটক থাকতে হতো। যখন ইচ্ছে বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন-বোধ ছিল না, যেমন ছিল না তাঁর আমিষ-ভোজনের প্রতি আসক্তি।

একসঙ্গে খেতে বসলে বক্সী বলতো, "ওঁকে খাইয়ে সুখ নেই, আমাদের পাশে

বসলেই তো বিম্নি হওয়ার কথা। উনি যে মালিক-পরিবারের আপনজন হয়ে গেছেন। ওদের স্বার্থ আর ওঁর ইষ্ট তো আর আলাদা নয়। মনের কাঠামো পর্যন্ত বদলে গেছে। এক দণ্ড বসে গল্প করতে দেখেছেন কেউ ?"

এই সব কথা হাসতে হাসতে হতো, বঙ্কিমবাবুর সামনেই। উনি প্রতিবাদ করতেন না। বোসও দেখেছি গায়ে মাখত না।

সেদিন আমি বললাম, "কেন ? ঐ তো অনেক দরকারী খবর এনে দিলেন—রেলের ডাক্তার নাও নাকি ডাঙ্গোয়াপোশি থেকে বেরিয়ে জামদা ডিঙিয়ে গুয়া চলে গেছে। অথচ বেম্বল সাহেবের সঙ্গে গড্‌ক্রে সাহেবের চুক্তিমত তাকে প্রতিবার এই পথ দিয়ে যাতায়াতের সময় আমাদের ক্যাম্পে ঘুরে যাওয়ার কথা।"

বক্সী একটা উপুড়-করা কেরোসিন টিনের ওপর বসেছিল, বললে, "ও ব্যাটার এসে কাজ নেই। রেলের লোকেরা বলে হাতুড়েটা দলা-দলা কুইনাইন গিলিয়ে পিলে ফাটিয়ে দেয়। জলজ্যান্ত মানুষকে রক্তপেচ্ছাব করিয়ে মারে।"

ওর কথায় আমরা বড় একটা আমল দিতাম না। কিন্তু আমার সামনে আজে-বাজে কথা বললে বোস খেপে যেত। ও বললে, "পিলে ফাটানো আর ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর এক ব্যাপার নয়, তাছাড়া ও হচ্ছে পাস-করা ডাক্তার—নাহলে কোম্পানি ওকে কাজ দিত না। মোট কথা ওর তো আসা উচিত, তারপর আমরা কুইনাইন খাই বা না-খাই আমাদের ইচ্ছে।"

আমি ম্যানেজার সাহেবের কানে খবরটা পৌঁছে দিতে, তিনি স্বয়ং ঘোড়ায় চেপে রেল লাইনের ধারে গিয়ে ডাক্তারের ফিরতি পথে তাঁকে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন।

বেচারা বোস। তাকেই প্রথমে ম্যানেজার সাহেবের তত্ত্বাবধানে একদলা কুইনাইন গিলতে হলো। সে একবার ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতে চেষ্টা করেছিল যে ওর জ্বরভাব পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু সাহেব হুঙ্কার ছাড়লেন, "প্রফিল্যাকৃটিক, মাই বয়।" চকচকে চশমার কাচের ভেতর দিয়ে চিকিৎসকের দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "গিভ হিম এ প্রফিল্যাকৃটিক্ ডোজ—"

খর্বকায় সাব-এ্যাসিস্টাণ্ট সার্জন ভয়েতে আরও কুঁকড়ে গিয়ে "ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার" বলতে বলতে বোসের চোখবন্ধ হাঁ-করা মুখের মধ্যে দশ-পনের গ্রেন যা হাতে উঠলো তাই ঠেসে দিল।

পাইকারী হাতে আনানো সেই কুইনাইন পোস্টঅফিসেও পাওয়া যেত। তার স্বাদ এমন উগ্র তেতো যে কি বলবো!

ম্যানেজার ও চিকিৎসক চলে যাওয়ার পর সকলে ভালমানুষ বঙ্কিমবাবুর উপর মহা খাপ্পা। বললো, "কি দরকার ছিল মশাই খবরটা দেবার ?"

তাদের নাকি নাড়িভুঁড়ি উঠে আসবার উপক্রম হয়েছে, কান ভোঁ ভোঁ করছে।

রাতে সবাই বিদায় নিলে শোবার আগে আমাকে পকেট থেকে কুইনাইনের দলা বার করতে দেখে বোস তো হতভম্ব—"সে কি! আপনি খাননি ? তবে যে নাকমুখ সিঁটকে সাহেবকে বললেন, 'বড্ড কড়া তেতো ভেরি ভেরি বিটার' !"

"সত্যি কথা বলতে কি, আমি হচ্ছি একটা কাওয়ার্ড্। তোমরা যা মুখভঙ্গী করতে লাগলে তা দেখে একটু হাতসাফাই না করে আর উপায় ছিল না। শার্টের পকেটটা হাঁ করাই ছিল তার মধ্যে টপ্ করে—কাউকে বলে দিও না যেন।"

বোস মরে গেলেও আমার নামে কোন অপবাদ রটাবে না সেকথা জানি বলেই কুইনাইন খাওয়া সম্বন্ধে নিজের সৎসাহসের অভাব প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করিনি।

মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে বঙ্কিমবাবুর নিয়ে-আসা টাকাপয়সা মিলিয়ে নিয়ে এসে ঠিকাদার ও শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করা হতো।

পুরুষ মজুরদের বলা হতো কুলি। তাদের দৈনিক রেট তিন আনা। মজুরণী অর্থাৎ রেজাগা পেতো দশ পয়সা। পরে ছয় আনা আর চার আনাতে ওঠে। পুরুষদের কাজ ছিল শাবল দিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি করা আর বড় বড় হাতুড়ি দিয়ে পাথরের চাঙড়গুলো ভেঙে টুকরো করা। ওদের হাতিয়ার ছিল ছেনি, হাতুরি, শাবল, বেলচা। রেজাদের কাজ ছিল মাথায় ঝুড়ি তুলে একদিকে মাল অর্থাৎ ম্যাঙ্গানিজ ও আর একদিকে রদ্দি ফেলে আসা। কুমুদ সেন রেজাদের মধ্যে থেকে বুদ্ধিমতী কয়েকজনকে বেছে নিয়ে গ্রেড অনুযায়ী মাল বাছাই করার কাজ শিখিয়েছিলেন। এরা ছোট ছোট মাতুর্ল অর্থাৎ 'ড্রেসিং হ্যামার' নিয়ে বড় চাঙড়গুলোকে ভেঙে তিন ভাগে ভাগ করে চাটা বাঁধতো। এসবের তদারক আমার কাজ নয়, কিন্তু শ্রমিকদের কাজ করবার সরঞ্জামের যথাযথ বণ্টন হচ্ছে কিনা দেখবার অছিলায় আমি মাঝে মাঝে হাজির হয়ে তাদের কাজ দেখতাম।

রেজাদের মধ্যে কেউ কেউ বড় বড় চাটার উপর উবু হয়ে বা পা ছড়িয়ে বসে দ্বিতীয়বার মাল বাছাই করতো। এরা প্রবীণা কিন্তু তরুণীদের মত ঘটা করে মাথায় ফুল গুঁজতো। পারিশ্রমিকের হারেও কোন তারতম্য ছিল না।

আমার কাছে সব চেয়ে অবাক লাগতো কেমন করে এরা একই ওজনের

ও একই রঙের মালের মধ্যে তফাৎ বুঝে আলাদা আলাদা চাটা বাঁধে। যেখানে মালের মধ্যে খাদের ভাগ প্রধানতঃ লোহা, সেখানে ওজন অনুপাতে তফাৎ টের পাওয়ার কথা নয়। রঙের ইতরবিশেষ থাকলেও আমার চোখে পড়তো না।

বোস বলতো, কেমিস্টরা নমুনা তুলে রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখেছে এদের বাছাই নির্ভুল।

ম্যানেজার সাহেব বড় একটা কারো প্রশংসা করতেন না। একবার কথায় কথায় আমাকে বলেন, "হেড অফিসের চীফ কেমিস্ট সেন যাদু জানে। যেমন চটপট করে রেজা বাছাই করেছে, তেমনি 'থরোলি' ওদের কাজ শিখিয়ে গেছে—ও হচ্ছে বর্ন টীচার।"

বোসকে সেকথা বলতে বলল, "উনি শুনলে বলবেন, প্রশস্তিটা ইউসুফের প্রাপ্য—নিজের প্রশংসা শুনতে তিনি ভালবাসেন না।"

তখনও ধাতু পাথরের আকর খোঁড়া সম্বন্ধে কোন সরকারী নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন হয়নি। রপ্তানির বাজার খুব মন্দা চলেছে। দেশীয় ইস্পাত তৈররি কারখানার যৎসামান্য চাহিদা নিজেদের আকর থেকেই সংগ্রহ হতো শুনতে পেতাম। বন্দর খরচ আর জাহাজের ভাড়া মিটিয়ে আটচল্লিশ গ্রেডের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন মাল বিদেশে চালান দেওয়া পোষাত না। এদিকে বাছাই করে খাদান কাটাও সম্ভব নয়।

ম্যানেজারকে বলতে শুনলাম একদিন, "আমি উৎপাদন বাড়াতে চাই, বাট্ ফর হেভেন্স সেক্ ডোণ্ট পিক্ দি আইজ—"

বলে কি! চোখ উপড়ে ফেলো না?

বোস আমার চেয়ে মাত্র মাস তিন-চার আগে এসেছে কিন্তু কুমুদ সেন আর ইউসুফের কাছে অনেক কিছু শিখে নিয়েছিল। বুঝিয়ে দিল উড়িষ্যার এই অঞ্চলের ম্যাঙ্গানীজ এলোপাথাড়ি খুঁড়ে খুঁড়ে তোলা চলে না—সেভাবে তুলতে গেলে ভেতরে কেমন করে ছড়িয়ে আছে আন্দাজ পাওয়া যায় না, সম্ভাবনার চিহ্নগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়াকে বলে চোখ উপড়ে ফেলা।

ভাল করে বুঝিনি কিন্তু সম্ভাবনার চিহ্নটা কি জানবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে রইল মনে মনে।

সুযোগ পেলেই গিয়ে দেখতাম। লম্বালম্বি বেশ চওড়া করে এক-একটা স্তর কাটা হতো। অনেক সময় মালের চেয়ে রদ্দির অংশ হতো বেশি। সবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। সুকেশ আর সুধীর এইসব কাজ তদারক করতো। হেড

অফিস থেকে খরচ কমাবার তাগিদ এলে ম্যানেজারের হুড়ো আসতো এদের ওপর।

বক্সী, সোয়ারিস প্রভৃতি ওভারসিয়াররা সাহায্য করতো হাজরি নেওয়া, চাটা মাপা ইত্যাদি নানা কাজে। ম্যানেজার ওদের সঙ্গে বড় একটা কথা বলতেন না, কিন্তু ওঁর উপস্থিতিতে সবার হৃৎকম্প শুরু হতো। বক্সী স্পষ্টাস্পষ্টি স্বীকার করতো আমাদের কাছে—"ব্যাটা এসে পড়লে হাঁটু দুটো কেমন যেন আল্‌গা হয়ে যায়—"

সেই একই বক্সী নেশার মৌতাতে এমন সব হঠকারিতার কাজ করে বসতো যে তাল সামলানো মুশকিল হয়ে পড়তো।

একদিন শুনতে পেলাম ম্যানেজার সাহেবের তাঁবুর কাছে মাদল বাজছে। রাত তখন নটা হবে। আমরা সবেমাত্র খাওয়া সেরে উঠেছি। মস্ত চাঁদ দেখা যাচ্ছে গাছের ফাঁকে। রেজাদের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। বোস বললে, "সাহেব রাউত্ মেটের হাত দিয়ে কুড়ি টাকা পাঠিয়েছেন। নাচ হবে। আজ বোধ হয় ওঁর জন্মদিন।"

নতুন কেমিস্ট সরকার মশায় বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক প্রবীণ হলেও খুব ভাবপ্রবণ লোক। বললেন, "আমরা নাচে যোগ দিতে পারি না?"

বক্সী হাত ধুচ্ছিল ঘরের বাইরে। সেখান থেকেই বললে, "আদেখ্‌লেপনা করলে শ্রেফ কচুকাটা করে ছেড়ে দেব।"

এই নতুন লোকটির উপর বক্সীর রাগ হয়েছিল অন্য কারণে, আর আমার কাছে সে নালিশও করেছিল। উনি নাকি বেহায়ার মত রেজাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

যাই হোক, রফা হলো আমরা সকলে জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে নাচ দেখবো।

বক্সী বলল, "আগে জমে উঠুক, আমি ততক্ষণ তাঁবুতে গিয়ে একটা কাজ সেরে আসি—," বলা মাত্র হাওয়া।

বোস বললে, "ওকে যেতে দেওয়া ঠিক হলো না, নেশা করে এলে—"

কথা শেষ হবার আগেই সরকার মশাই বললেন, "বিলক্ষণ, আমি ধরে আনছি—"

বোস অসহায়ের মত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "এবার দুজনকে সামলাতে হবে।"

বক্সীকে ধরে আনতে সরকারের বেশ কিছু সময় লেগেছিল। দেখলাম বোসের অনুমান মিথ্যা নয়। দুজনেরই দিব্যি রঙিন অবস্থা। ওদিকে মাদলের আওয়াজে

বোঝা গেল যে নাচ জমে উঠেছে।

আমরা কোন বাতি না নিয়ে গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গিয়ে এক-একটা বড় বড় পাথর বেছে নিয়ে বসে গেলাম।

অপূর্ব দৃশ্য। বড় গাছের ডালে ডালে তিনটে পেট্রোম্যাক্স বাতি ঝুলছে। তার আলো জ্যোৎস্নাকে হার মানাতে না পারলেও ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ে অদ্ভুত বিভ্রমের সৃষ্টি করেছে। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হলো নাচের আসরটা যেন পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়ের গায়ে গুহা আর ঐ গুহার গোলকধাঁধা থেকে মানুষগুলো বেরিয়ে এসেছে।

ছেলেমেয়েরা পরস্পরের পিঠের উপর দিয়ে হাতে হাতে শিকল রচনা করে মাদলের তালে তালে এগুচ্ছে পেছুচ্ছে। নিকষকালো সুস্থ সুঠাম আদুড় গায়ের মাঝে ম্যানেজার সাহেবের খাকি শার্ট-প্যান্ট পরা লম্বা শরীর উৎকট ভাবে বেখাপ্পা মনে হচ্ছিল।

কেমিস্ট সরকারকে বুঝিয়েছিলাম যে চাকরি বজায় রাখতে গেলে নিঃসাড়ে লুকিয়ে বসে দেখতে হবে। হঠাৎ নজরে পড়লো বক্সী নেই। দেখি সে কোন্ ফাঁকে বোসের নজর এড়িয়ে আসরে নেমে পড়েছে! ম্যানেজার সাহেবের পাশের মেয়ের পিঠে তার হাত।

আমি উপস্থিত দর্শকবর্গকে বললাম, "আর না, এবার ফেরা যাক, মশা কামড়াচ্ছে—"

অনিচ্ছুক সরকার মশায়কে একরকম টানতে টানতে এনে আমি সুধীরের হেপাজতে রেখে মাদলের শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে কাজে বেরোচ্ছি এমন সময় বক্সী কোথা থেকে এসে যাত্রাদলের নায়িকার মত নাকে কেঁদে পড়ল, "কি হবে আমার ঘোষ সাহেব?"

বিরক্ত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "কিসের কি হবে?"

"এই বাজারে কাজ গেলে যে পথে বসবো, স্যার।"

"নাচতে যাবার আগে সেকথা মনে হয়নি?"

বক্সী বলল, "সরকার মশায় যে আমাকে উস্‌কে দিলেন। তারপর নিজেই—"

বোস কাছেই ছিল। বক্সীকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "আর একবার তো এই একই ব্যাপার ঘটেছিল—তখন তো সরকার মশায় ছিলেন না। তখন যখন চাকরি যায়নি এবারেও যাবে না। কে কাকে উস্‌কে ছিল কে জানে!"

কেশবাবুর কাছ থেকে একটা বড় স্কেলের নক্সা চেয়ে নিয়ে আমি আমার পরিচিত জায়গাগুলো মিলিয়ে দেখতাম। উলিবুরুর মধ্যে আর কাছাকাছি দু'এক মাইল পরিধির ভেতরে যতগুলো ম্যাঙ্গানিজ খাদান খোলা হয়েছে অথবা গর্ত করে মাল পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা হয়েছে সেগুলি সুযোগ পেলেই দেখে আসতাম। কেশবাবুর জরিপের কাজ চলেছিল আরো দূরে দূরে। বিরাট পঁয়তাল্লিশ মাইল জুড়ে জঙ্গল এলাকার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ইজারার সীমানা ধরে গাছ কেটে যথাযথ লাইন করে থাম বসিয়ে যাওয়ার কাজ সহজ নয় বলেই আমি দুর্নিবার ভাবে আকৃষ্ট হতাম। মনে হতো রীতিমত একটা চ্যালেঞ্জ। তার ওপর করদ রাজ্যের আমিনদের সময়মত দেখা পাওয়া ছিল দুষ্কর। অনেক কাজ যুক্তভাবে না করলে নয়, অথচ দীর্ঘ পথ গিয়ে সারাদিন অপেক্ষা করেও দেখা মিলতো না। ম্যানেজারের কাছে নালিশ করে লাভ হতো না। উল্টে ধমক খেতে হতো, "ওদের মর্জির ওপর নির্ভর করলে কোনকালেই কাজ শেষ হবে না—ঘাড় ধরে কাজ করিয়ে নিতে পারো না?" উপরন্তু আরও কঠিন কাজ ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। আমি দু'চারবার ওঁর হয়ে ম্যানেজারের কাছে দরবার করতে গেছি, কিন্তু তাতে ফল হয়নি। বোস বলতো, "কেন মুখ নষ্ট করতে যান! একবার জিদ চাপলে রক্ষে নেই—কেউ কিছু বলতে গেলে চাপটা বেড়ে যায়। ফুলচাঁদবাবুকে চোখের জলে নাকের জলে করে ছেড়েছিল।"

আমি অবশ্য নেহাৎ নিঃস্বার্থ মন নিয়ে দরবার করতে যেতাম না। ভাবতাম হয়ত একদিন বিরক্ত হয়ে এই ধরনের কোন কাজ চাপিয়ে দেবেন আমার ঘাড়ে।

উল্টে বললেন, "তোমাকে ওদের কাজ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। তোমার সে যোগ্যতাই নেই।"

এই মোক্ষম উত্তর পাওয়ার পর থেকে আমার উৎসাহ কিছুটা দমে যায়।

বোসকে অবশ্য সেকথা জানাইনি।

অল্প সময়ের মধ্যে ইউসুফ আমাকে অনেক কথাই বলে গিছল।

সে বলেছিল, "আমরা আশা করেছিলাম ইস্পাত কারখানাটা চালু হলে এত বড় এলাকার অনেক জায়গায় লোহা আর ম্যাঙ্গানিজ দুই ধাতু পাথরেরই উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে। পাকা রাস্তা তৈরি হবে, লোকের বসতি বাড়বে, কিন্তু সে

পরিকল্পনা ধামাচাপা পড়েছে। লর্ড্ কেব্ল নিজের পুঁজি টাকায় হাত দেবেন না। চেষ্টায় ছিলেন কোন ধনী নবাবকে জপিয়ে টাকা তোলার। কথাবার্তা অনেকখানি এগিয়েও শেষ পর্যন্ত ফেঁসে যায়। এখন একমাত্র ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানির ওপর নির্ভর করলে রেলপথের ধারে-কাছে ছাড়া আর কোথাও হাত পড়বে না।"

ইউসুফ এই সব কথা বলতে বলতে আমাকে নিয়ে গিছল উলিবুরু পাহাড়ের এমন এক জায়গায় যেখান থেকে পুব ও পশ্চিম দুদিকেই আকাশজোড়া গিরিপুঞ্জ দেখা যায়। তারপর একখানা কাপড়ে-বাঁধাই ভাঁজকরা সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার ম্যাপ হাঁটুর উপর মেলে বলেছিল, "পশ্চিমের ঐ বিরাট পাহাড়টা খাঁটি লোহায় ঠাসা। মধ্যিখানে একটা চওড়া ফাটলের ভেতর দিয়ে ঝর্ণার জল এসে কারো নদীতে পড়ছে। সেই ফাটলের নাম দিয়েছি আমরা 'পানপোশ গর্জ'। অমন সুন্দর জায়গা কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু জানোয়ারের ভয়ে সেখানে ক্যাম্প করতে সাহস করিনি। নিচের দিকে ছোট একটা গ্রাম আছে—নাম বোলানী। আমরা থাকতাম হরমটো গাঁয়ে—বেশ খানিকটা দূরে। গিরিখাতের ভেতরে ঢুকলে ভয় হয়। দুদিকে জমাট লোহার দেওয়াল খাড়া হয়ে আকাশে উঠেছে। মনে হয় 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রবলে ক্ষণিকের জন্যে চিরে ফাঁক হয়েছে, আবার কেউ 'চিচিং বন্দ' বলে না বন্ধ করে দেয়! তিন হাজার ফুট উঁচু ঐ লোহার পাহাড়ের উপর দিয়ে গেছে উড়িষ্যার কেওঞ্জর রাজ্য আর বিহারের সীমানা। তারপর দেখছ কাছের আর একটা আরও নিচু রেঞ্জ একই ভাবে পশ্চিম ঘেঁষে দক্ষিণ দিকে চলেছে, ওটার মধ্যেও প্রচুর লোহা আছে—ওটার নাম হচ্ছে ভাগিয়াবুরু—কাছাকাছি দুটো ছোট ছোট গ্রাম আছে বড়বিল আর বিলকুণ্ডি। আর পূবের দিকে যে বিরাট পাহাড় দেখছ তার নাম ঠাকুরাণী—এটাও তিন হাজার ফুট উঁচু আর খাঁটি লোহা পাথরে ঠাসা—সমান্তরাল রেখার মত একই দিকে চলেছে। মধ্যে মধ্যে তলার দিকে আছে অসংখ্য ছোট-বড় ম্যাঙ্গানিজের আকর। আমরা মোটামুটি চিহ্ন দিয়ে রেখেছি ম্যাপে কিন্তু ভাল করে দেখা হয়নি। দেখার তাড়াও নেই—ত্রিশ বছরের জন্যে নেওয়া ইজারা আরও ষাট বছরের মত বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। আপাতত মন্দার বাজার চলেছে—"

আমি অন্যমনস্ক হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে তাকিয়েছিলাম। মন চলে গিছলো অনেক দূরে। পূর্ববঙ্গের এই মুসলমান ভূতত্ত্ববিদের একটা হাল্কা কথা 'চিচিং ফাঁক' আমাকে কোন্ শৈশবে নিয়ে গিছলো তার ঠিকঠিকানা নেই—সে জগতে আমার মা বাবা ভাই বোন সবাই প্রাণবন্ত ভাবে বর্তমান।

আলিবাবার গল্প কার কাছে প্রথম শুনেছিলাম তা মনে নেই—মা, দিদি কিংবা আফ্রিকার হীরালাল কাকীমাই সেই অপূর্ব কাহিনী শুনিয়ে থাকবেন। তাঁরা কেউ ইহজগতে নেই, কিন্তু উড়িষ্যার গহনবনে ক্ষণকালের জন্যে ইউসুফের মধ্যে তাঁদের উপস্থিতি অনুভব করলাম।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পর্বতশ্রেণী, উলিবুরুর মত অনেক খণ্ড খণ্ড পাহাড়, আর তার মধ্যে নদী-নালা সব কিছু ঢেকে রেখেছে এক অখণ্ড দুর্ভেদ্য জঙ্গল। নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে ভূপৃষ্ঠের ঘোঁজ-ঘাঁজ, গভীর খাত আর অসংখ্য ম্যাঙ্গানিজ ধাতুপূর্ণ টিলার কিছুই চোখে পড়বে না।

ক্যাম্পে ফেরার পথে ইউসুফ দক্ষিণ দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "ঐ টিলা-গুলোর একটার নাম ভদ্রাসাই আর আরও কিছু দক্ষিণে 'সিদ্ধমঠ'। কিন্তু ওখানে কোনও মঠের ধ্বংসাবশেষ নেই। হয়ত কোন সময় বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের বিশ্রামের জায়গা ছিল। আরও মাইল ত্রিশ-চল্লিশ দক্ষিণে প্রাচীন ছবি আঁকা এক গুহা আছে তার নাম 'সীতাভীঞ্জ'—কারা এইসব নামকরণ করেছিল কে জানে!

ইউসুফ বার্ড কোম্পানির কাজ ছেড়ে কোথায় যাবে তা তখনও স্থির করেনি। কথা হচ্ছিল সে চলে যাওয়ার আগের দিন রাত্রে—সেদিন ভিন্ন ক্যাম্পের দু'চারজন লোকও বেড়াতে এসেছিলেন। ইউসুফ বললে যে সে প্রথমে দেশে গিয়ে মনের আনন্দে আম, কাঁঠাল আর মাছ খেয়ে নেবে তারপর অন্য কথা। খাবার ঘরে মাটির চিবির আসনে বসে সে আরও বলে—দেশের বিখ্যাত সরভাজার কথা।

পরের দিন বোস অনেক রাত পর্যন্ত ইউসুফের সঙ্গে গল্প করলো। বলল, "ওঁর এখানে মায়া পড়ে গিছল, আমাদের ছেড়ে চলে যেতে ভাল লাগছিল না বলেই ঘটা করে দেশের গল্প ফেঁদেছিলেন।" মনে হলো সেই জন্যেই বোধ করি এতখানি দরদ দিয়ে জঙ্গলী জায়গাগুলোকে স্মরণ করছিল।

॥ ১৫ ॥

আমি কাজ করতাম একটা বড় গাছের তলায় বসে। ডালপালা দিয়ে তৈরি পাতার ছাউনি ঘরের মধ্যে প্যাকিং বাক্সের কাঠ কেটে কতকগুলি লম্বা লম্বা তাক করা ছিল। রেল কোম্পানির মালগাড়িতে যেসব যন্ত্রপাতি আসতো সেগুলোকে চালানের সঙ্গে মিলিয়ে গুছিয়ে রাখা হতো তাকের উপর। খাতায় লেখা, বণ্টন

করা, সপ্তাহে সপ্তাহে মিলিয়ে দেখা ছিল আমার কাজ। উপরন্তু আমি প্রতি মঙ্গলবার মজুর ও রেজাদের সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক বিলি করাতে সাহায্য করতাম। এ কাজটা একরকম আগবাড়িয়ে ঘাড়ে নিই। মেয়েরা সেদিন সকাল সকাল ছুটি নিয়ে নালার জলে স্নান সেরে, কাপড় কেচে শুকিয়ে নিত। তারপর পরিষ্কার শাড়ি পরে, চুল আঁচড়ে মাথার একপাশে জড় করে তাতে উজ্জ্বল রঙের ফুল গুঁজে হাসিখুশিতে ভরপুর হয়ে রোজগারের সামান্য পয়সাকড়ি নিতে আসতো। টাইমকীপার কিংবা ওভারসিয়ারদের মধ্যে কেউ ডাক ছাড়তো—রাইমনী, বালেমা, গাঙ্গী, ফুলমণী, চাম্বিবা ইত্যাদি ইত্যাদি। ওরা একে একে এগিয়ে এসে সলজ্জ মধুর কণ্ঠে 'হাজির' বলে সাড়া দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিত। তারপর নিরাভরণ নিকষকালো সবল সুঠাম বাহু দিয়ে পরস্পরের পিঠের উপর শৃঙ্খল রচনা করে গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরতো। এই অনাবিল আনন্দোচ্ছ্বাস আমার মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিত।

বক্সী ওদের ভাষা শিখেছিল। একদিন জানতে চাইলাম গানের কথাগুলোর মানে।

সে বললে, "ওরা তো বুনো মেয়েমানুষ, রসের কি বোঝে? যত সব আজে-বাজে ঘর-সংসারের খুঁটিনাটি কথা। ওদের মধ্যে কি জয়দেব, বিদ্যাপতি জন্মেছে? এই ধরুন না আমাদের সামান্য গ্রামীণ কবি—"

বোস চট্ করে মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনি খেপেছেন, জিজ্ঞেস করবার আর লোক পেলেন না? এক্ষুনি যাত্রার পালা শুরু হয়ে যাবে। আজকে না জামদার হাট দেখতে যাওয়ার কথা? সকাল সকাল না বেরিয়ে পড়লে রোদ্দুরে কিন্তু ঝলসে যেতে হবে।"

আসলে গভীর জঙ্গলের ভেতরে পায়ে চলা পথে দুপুরেও তেমন রোদ ঢুকতে পারে না, তবে চড়াই উৎরাই করতে করতে গলদঘর্ম হতে হয়। বোস অবশ্য আমাকে গ্রামীণ কবির অশ্লীল আদিরসাত্মক রচনা শোনা থেকে রক্ষা করার সাধু উদ্দেশ্যেই বাধা দিল, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন ফল হলো না। বক্সী আমাদের সঙ্গে গেল। নালার ধারে বিশ্রাম করবার সময়ে একদল মেয়েকে দূর থেকে দেখে সে গুনগুন করে গান ধরল,

> "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়ে যায়
> ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
> মদন মুরছা পায়—"

বোস ধমক দিয়ে বললে, "থামুন মশাই, ওরা ভাববে কি!"

বক্সী দমবার পাত্র নয়, "বেশ, যদি মনে করেন এরা জ্ঞানদাসের ভাষা বোঝে তা হলে রামীর ভাষায় গাই—

"পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে?
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু,
তিতায় তিতিল কে—"

বোস হাল ছেড়ে দিয়ে আমার দিকে করুণভাবে তাকাতে আমি বললাম, "সুরটা তো ভারী মিষ্টি—কোথায় যেন শুনেছি—ভাষাটা অবশ্য আমিও বুঝিনি তবে ব্যাখ্যাটা পরে শোনালেই হবে। এবার ওঠা যাক—"

হাটে যাচ্ছি শুনে সুধীর বলেছিল, "হাট দেখতে হয় তো চাইবাসাতে যেতে হয়। অত বড় হাট আর এ তল্লাটে নেই। বেসাতি নিয়ে লোক আসতে শুরু হয় আগের দিন থেকে। লোকেরা কাচ্চাবাচ্চা কাঁধে নিয়ে মাথায় বিক্রির জিনিস চাপিয়ে নাকি পঁচিশ-ত্রিশ মাইল পথও হেঁটে আসে। মিশনারীদের প্রভাবে সেদিকের কোল, হো আর মুণ্ডা মেয়েরা জামা পরতে শিখেছে—সভ্য হয়েছে।"

জামা পরে সভ্য হওয়ার কথা শুনে আমার ভাল লাগেনি সেদিন। পূর্ব আফ্রিকার ছোট-বড় কয়েকটি লোকালয়—নাইরোবি, মোম্বাসা, নাকুরু, মোশী, কিসুমু সর্বত্র দেখে এসেছি এই ধরনের শোচনীয় মিশনারী প্রচেষ্টা। কিকুয়ু, মাসাই, নান্দি, চাগ্গা, সোমালী, কাভিরণ্ডু সকল উপজাতির নরনারী শার্ট প্যাণ্ট আর সেমিজের আবরণে নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাচ্ছিল হয়ত ধর্মযাজকদের প্রচেষ্টা ছাড়া আরও অনেক কারণে। নিজেদের গৃহস্থালী জমিজমা ছেড়ে ছড়িয়ে পড়লে নিশ্চয়ই হাব-ভাবে পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন আসা অনিবার্য।

এইসব সমস্যার কথা মন থেকে সরিয়ে ফেলে সুধীরকে বলেছিলাম সেদিন, "আমাদের পক্ষে জামদার ছোট হাটই ভাল—"

সরকার মশায় বললেন, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—আমি ছোট হাটেও যেতে প্রস্তুত নই।"

ওঁকে সঙ্গে না নিয়ে সুবিধাই হলো। আমাদের মত তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারতেন না, তাছাড়া চলন্ত অবস্থায় তাঁর রসালো গল্প তেমন জমত না।

বসন্তকালের ফুল, পাখি ও প্রজাপতি যখন গ্রীষ্মের খরায় একে একে বিদায় নিয়ে গেছে, শালের মঞ্জরীও ঝরে ঝরে নিঃশেষপ্রায়, তখন গাছে গাছে নতুন

করে পাতা গজাবার সময় হলো। কুসুম, রিমুড়ী, অসন, কয়ম, কদম ও কেন্দু গাছে দেখতে দেখতে পাতা বেরোল। তারপর শালের পাতা গজাতে শুরু হলো। কেশবাবুর কাছে শুনলাম এর পর দিনকয়েকের মধ্যে চাঁর, ঢোঁড়া, মহুয়াতে পাতা এসে যাবে।

এই সকল আজেবাজে বিবরণ টুকে রাখতাম দেখে বোস কি ভাবতো জানি না। তার ছোট্ট ডায়েরিখানাতে সে কি লিখে রাখতো জানবার জন্যে আমার কৌতূহল হতো কিন্তু কোন প্রশ্ন করিনি। বোধ করি মনের আবেগের কথা দিয়েই পাতা ভরাতো—সেইজন্যে খাতাখানাকে গোপন রাখার অশেষ চেষ্টা দেখতাম।

হাটে যাওয়ার পথে বেশির ভাগ গাছ হচ্ছে শাল। তাছাড়া কেশবাবু চিনিয়ে দিলেন ঢোঁড়া, কেন্দু, করণ, অসন, কুসুম, শিমূল, বট, শিশু, কুরচি, ধাতকী, নিম, মহানিম, বাঁশ আরো কত কি।

দূরের পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে নানা স্তরের সবুজের মধ্যে এক-একটা কালচে-লাল গাছ দেখিয়ে কেশবাবু বলেন, "ঐ দেখুন, কুসুমের পাতা বেরিয়ে গেছে।"

হাট বসতো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জঙ্গলী আমগাছের নিচে। কিছুদূরে খোলা জায়গাতে বাজি রেখে মোরগ লড়াই-এ পুরুষেরা মেতে থাকতো। আরো কিছু দূরে তেঁতুলতলায় হাঁড়িয়া বিক্রেতারা বড় বড় কলস আর কাঁচ শিয়াড়ী পাতার ঠোঙা নিয়ে বসতো। সেখানেও কেবল পুরুষদের ভিড়। মোরগ লড়াইয়ে যারা জিতেছে আর যারা হেরেছে দু' পক্ষই বসে খেত। মেয়েরা সেদিকে বড় একটা ঘেঁষতো না, তারা তাদের কেনা-বেচার জিনিস ছড়িয়ে বসে গল্প জুড়ে দিত। সপ্তাহে মাত্র একদিন দেখা হয় তাই পরস্পরের গ্রামের, ঘর-সংসারের, সুখদুঃখের কথা বলে।

জঙ্গলের মধ্যে অনেক কাঁঠাল ও বেল গাছ দেখেছি। বেওয়ারিশ মাল, কোন দাবিদার নেই। বড় বড় গাছ থেকে ছোট ছোট হলুদ রঙের আম পড়তো টুপ টুপ করে। কেবল আঁটি সার, শাঁস কম তবে মিষ্টি। ফলসা জাতীয় চাঁর ও কেন্দু ফল আদিবাসীদের প্রিয় ছিল।

চৈত্রশেষে বনের মাঝে পলাশ নিঃশেষ। তখন নীল আকাশের পটের উপর উজ্জ্বল লাল রঙের শিমূল ফুল শোভা পায়। জঙ্গলী বেল, হরতুকী-বহেড়ার ফল পেকে গাছের তলায় ছড়িয়ে পড়ে থাকে। আমলকীরও দিন প্রায় শেষ। তারও আগে ফাল্গুনের শুরুতে গেছে কদম। বসন্তের শেষের দিকে শালের মঞ্জরী ঝরেছে অঝোরে। এখন নতুন পাতা গজাবার সমারোহ। মধ্যে মধ্যে দেখি টগরের মত

দেখতে তবে আকারে অনেক বড় ফুল, ফোটার সময় সাদা, পরে হলুদ, আদিবাসীরা বলে গুরডু। পাটকিলে-লাল রঙের ধাতিং ফুলের রস নাকি চিনির মত মিষ্টি। মহুয়ার হলুদ ফুল এখনও টুপ টুপ করে ঝরছে।

জঙ্গলের মাঝখানে এক জায়গায় দু'তিনটে কাঁঠাল গাছ দেখিয়ে বোস বলল, "এককালে এখানে নিশ্চয় কোন গ্রাম ছিল। কেশবাবু বলছিলেন—"

বক্সী বলে বসলো, "গাঁজা—", তার পর বোসের ভ্রূকুটি দেখে বলল, "ও কি জানে? বোলানী গাঁয়ের মাথায় অজস্র কাঁঠাল গাছ আছে। শুনেছি সেখানে কোনকালেই মানুষের বসতি ছিল না যেহেতু কাছাকাছি জল নেই। তাছাড়া—"

বোস বিরক্ত হয়ে বললে, "কি বলছিলাম শোনবার আগেই—"

"আপনি যা ইচ্ছে বলুন শুনতে আপত্তি নেই, কিন্তু ঐ 'গবা'র কথা বললেন কিনা তাই থাকতে পারলাম না। ও কি বলেছে জানেন? হনুমান নাকি গন্ধমাদন পাহাড়টার সবটা তুলে নিয়ে যেতে পারেনি বলে খানিকটা এখনও ওর মামার বাড়ির দেশ সুয়াকাটিতে পড়ে আছে—"

বোস বলল, "উনি ঠিকই বলেছেন, কেওঞ্ঝরগড় থেকে গন্ধমাদন পাহাড় দেখা যায়—সেখানে আমাদের কোম্পানিকে তো লোহার খনি ইজারা নেওয়া আছে—"

"ও সেকথা বলেছে? একেবারে গাঁজা—", বোস আরক্ত হয়ে বললে, "ইউসুফ সাহেব বলেছেন, তাছাড়া আমি ম্যাপে দেখেছি—ওখানে বিশল্য-করণী লতা ছাড়া আরও অনেক ওষধি গাছগাছড়া পাওয়া যায় নাকি—"

বক্সী বললে, "ওসব এখানেও প্রচুর পাওয়া যায়।" সে ছুটে গিয়ে সজনে ফুলের মত দেখতে লালচে-বেগুনী রঙের একগোছা ফুল ছিঁড়ে এনে বললে, "এই তো গিলেরী—খেতে যেমন সুস্বাদু, তেমনি শরীরের পক্ষে উপকারী। একটু আগে ফেলে এলাম মুনকালি, বাচ্ছাদের পেটের গোলমালে অব্যর্থ ওষুধ, তাছাড়া ওখাই গাছের ছাল কাটা-ছেঁড়া সারায়, চুনকুড়ীর ছাল আমাশার মহৌষধ—সবই এখানে পাবেন—।" এগিয়ে গিয়ে কুসুম গাছের লাল-লাল কচি পাতা দেখিয়ে বললে, "এও তো পুষ্টিকারক খাদ্য, তাছাড়া হাড় জোড়বার রক্তপড়া বন্ধ করার হরেক রকম অব্যর্থ ওষুধের ছড়াছড়ি। হনুমানের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, পাণ্ডববর্জিত সুয়াকাঠি গাঁয়ে পাহাড়ের সন্ধানে যাবে—"

বোস বললে, "যাত্রার পালা মুখস্থ করে করে ইতিহাস পর্যন্ত গুলিয়ে গেছে—হচ্ছিল রামায়ণের কথা—এসে গেল মহাভারত—"

আমি ওদের তর্ক থামিয়ে দিয়ে বললাম, "পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয়দের সব চেয়ে বড় উৎসব ছিল রামলীলা। সেদিন আমরা যেতাম আর্য সমাজের স্কুল-সংলগ্ন মাঠে রাক্ষসরাজ রাবণ আর তাড়কা রাক্ষসীর নিধন-পর্ব দেখতে। দু'তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু কাঠের ফ্রেমের উপর কাপড় মুড়ে তাতে রং মাখিয়ে বিরাট দশানন মূর্তি তৈরী করতো পাঞ্জাবী ছুতোর মিস্ত্রীরা। কিছু দূরে তারাই গড়তো ভয়ঙ্করী রাক্ষসী। ভেতরে পোরা হতো কেরোসিন তেলে চোবানো কাপড়-চোপড়, কাঠকুঠো, কাগজ আর বোমা-পটকা। নির্দিষ্ট দিনে প্রবাসী ভারতীয় ছাড়া স্থানীয় কিকুয়ু ইত্যাদি আদিবাসীরাও ভিড় জমাত। যথাসময়ে রাম ও লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ ঘাড়ে নিয়ে আসরে উপস্থিত হতেন। তাঁদের পিছন পিছন আসতো হনুমান ও জাম্বুবান। শেষের দুজনেই হচ্ছে মুখোশ-পরা মানুষ। রাক্ষস-রাক্ষসীদের তুলনায় খুবই নগণ্য চেহারা। রণক্ষেত্রে এসে যতই লাফালাফি করুক না কেন আমাদের কাছে তাদের আস্ফালন ধৃষ্টতা মনে হতো। মুখোশ আর নকল ল্যাজে হনুমানকে মনে হতো একটা ভাঁড়। অতিকায় রাক্ষসদের চলৎশক্তি না থাকলেও আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আটকে থাকতো তাদের দিকে। যথাক্রমে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁর ভ্রাতৃভক্ত অনুজ এমন জোর তীর ছুঁড়ে দিত যে রাবণ ও তাড়কার শরীর থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সঙ্গে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসত। তারপর বিকট শব্দে বোমা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ছড়িয়ে যেত আকাশে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। তার মধ্যে হনুমানের লম্ফঝম্প একেবারে বাঁদরামি মনে হতো।"

গল্প করতে করতে হাটে পৌঁছে গেলাম। একধারে ঘনপাতা কুসুমগাছের গাঢ় ছায়ার আড়াল থেকে আদিবাসী যুবক-যুবতীর কলরোল শোনা যাচ্ছিল। দেখি একটি মেয়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালাচ্ছে আর একটি ছেলে তাকে যেন ধরতে চেষ্টা করে পারছে না। বক্সী দাঁড়িয়ে গিয়ে বললে, "একটু পরে ধরা দেবে, তারপর দু-তরফের আত্মীয়স্বজন হাজির হয়ে ওদের দুজনের বিয়ের ব্যবস্থা করবে।"

বোস বললে, "বিয়ে নয়, বাগদান—"

"একই কথা—"

হাট থেকে ফেরবার সময় ক্লান্ত হয়েছিলাম বলে লক্ষ্য করিনি। বোস অস্বাভাবিক ভাবে গম্ভীর হয়ে গিছলো। বক্সী কি কথা প্রশ্ন করে উত্তর না পাওয়ায় আমি বললাম, "ব্যাপার কি? মনে হচ্ছে রাগ হয়েছে—"

উত্তর শুনে অবাক হলাম। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "রামায়ণের হনুমানকে বানর বলে ভাল করেননি। বক্সী কেশবাবুকে জালিয়ে ছাড়বে।"

মনে হলো তারই কোন প্রচ্ছন্ন ধর্ম-বিশ্বাসকে অজান্তে আঘাত করে বসেছি। কেশবাবুর জন্যে দুশ্চিন্তাটা গৌণ।

ছোটবেলায় দিদিকে দাদাদের মধ্যে কেউ ভূতের ভয় দেখালে তাকে বলতে শুনেছিলাম, "ভূত আমার পুত, শাঁখচুর্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছেন করবে আমার কি?"

সেই কথা মনে পড়ল।

॥ ১৬ ॥

সেদিন ক্লান্ত হয়ে ফিরে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। মনটাও ভাল ছিলো না। হাট থেকে ফিরেই খবর পাই দুজন শ্রমিক রক্তআমাশয়ে মারা পড়েছে। বস্তিতে গিয়ে দেখি গোর দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে মহা হইহল্লোড় করে। অনেকে অতিমাত্রায় হাঁড়িয়া খেয়ে শুয়ে কিংবা বসে হল্লা করছে। সেদিকে না গিয়ে নালার জল যেদিকে নেমেছে সেদিকের বস্তিবাসীদের সাবধান করতে গিয়ে দেখি মেয়েরা জলের কলস ভরছে। তারা ক্লান্ত, পুরুষেরা মদ খেয়ে বেসামাল। ঠিকাদারকে খুঁজে বার করে দায়িত্ব চাপিয়ে আসতে অন্ধকার হয়ে গেল।

গভীর ভাবে ঘুমিয়েছিলাম। ঘরে ঢোকার ফাঁকটার ঝাঁপি খুলে ওভারসিয়ার গোমেশ কখন ঢুকেছিল আমরা টের পাইনি। রাত একটা হবে তখন। দুঃস্বপ্নের সঙ্গে হাউমাউ শব্দে তার কান্না মিশে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে গিছলো বলে ধড়মড়িয়ে উঠে বসেও প্রথমটা চিনতে পারিনি।

বোসের ধমকে চমক ভাঙল—"স্পিক্ আপ ম্যান—"

গোমেশ কিছুটা সামলে নিয়ে বললে, "মাই ওয়াফ ডাইং, ডাইং—ঘোষ সাহাব—প্লিজ জলদি আইয়ে—ক্রাইস্টকা কাশম্—"

এই লোকটির প্রকৃত পরিচয় গোমেস নয়। আসল নামটা বলবার দরকার নেই। চোখের তারার রঙে পিঙ্গলের আভাস দেখে বোঝা যায় যে কিছু পরিমাণে বিদেশী রক্ত মিশে থাকবে। নিজের পরিচয় দিত আধা পর্তুগীজ বলে কিন্তু উত্তেজিত হলেই মুখ থেকে উর্দু বুলি বার হতো।

আমি তো হতবাক। বোসকে বললাম, "এখানে স্টাফ্‌দের মধ্যে একজন যে

পরিবার নিয়ে আছে সে কথা তো জানতাম না। কই তুমি তো বলনি—"

বোস উত্তর না দিয়ে ওষধের বাক্স আর একটা মোটা লাঠি সঙ্গে নিল। যেখান থেকেই ডাক আসুক না কেন ও সব সময় আমার সঙ্গে যায়। আমি হাতঘড়িটা পরে নিলাম। ওটা ঠিকমত সময় না রাখলেও ওর একটা মহৎ গুণ ছিল যে অন্ধকারে রেডিয়াম লাগানো কাঁটাগুলো দেখা যেত। ডায়ালটা প্রায় পকেটঘড়ির মত বড়। সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে যখন রোগীর নাড়ী টিপতাম তখন আমাকে বিজ্ঞের মত দেখাতো সে কথা বোস পর্যন্ত মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছে। বুক পিঠ দেখার যন্ত্রপাতি যখন নেই তখন কিছুটা সময় এইভাবে কাটিয়ে ওষুধ-পথ্য দিলে রোগী ও দর্শকেরা খুশি হয়। হাতের কোনখানটায় টিপলে রক্ত চলাচলের গতিটা টের পাওয়া যায় সে কায়দাটা নিজের উপর অভ্যাস করে পোক্ত হয়ে গিছলাম। অবশ্য তার তারতম্য অনুযায়ী ব্যাধির গুরুত্ব বোঝা যে আমার সাধ্যাতীত সে কথা বোস জানতো, তবু গুরুগম্ভীর জিজ্ঞাসু মুখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমার প্রতি তার এ আস্থা বোধ করি রুগীর প্রতি সংক্রামিত হতো। সেই জন্যে আমি ওকে সঙ্গে নিতে পারলে খুশি হতাম।

আমি পেট্রোম্যাক্স বাতিটা ওর হাতে দিয়ে ওষুধের বাক্সটা নিজের হাতে নিলাম। অকারণে বন্দুক বহনের মোহ ততদিনে কেটে গেছে।

গোমেশকে ম্যানেজার সাহেব কোথা থেকে সংগ্রহ করে এনে খনির কাজে নিয়োগ করেছিলেন সে কথা রহস্য-ঢাকা ছিল বলে বক্সী তার কল্পনা-শক্তি প্রয়োগ করে অনেক আজগুবী কথা বলতো। এ রহস্যের কারণ গোমেশ-এর পূর্ব-জীবন সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতো না। তাছাড়া সে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়নি। পাহাড়ের উপর থেকে ছোট তাঁবুটা তুলে নিয়ে গিয়ে নদীর ধারে কোন নিরালা জায়গায় পাতে, তারপর একটা কুটির বানিয়ে নেয়। এ সব অবশ্য শোনা কথা। ভেবেছিলাম হয়ত বক্সীর অবিরাম যাত্রার পালায় অতিষ্ঠ হয়ে জায়গা বদল করে থাকবে।

গোমেশ-এর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় খাদানের যন্ত্রপাতি বিলি করবার সময়ে, ওকে গোয়ানিজ ভেবে কঙ্কনি ভাষাটা ঝালিয়ে নেবার চেষ্টা করি। উত্তর পাই চোস্ত উর্দুতে।

সে-রাত্রে কিছু কিছু চাঁদের আলো ছিল। ঘোরা পথে পাহাড় থেকে নেমে এসে আমরা নালার ধারে একটি ছোট্ট ছিমছাম কুটির দেখতে পেলাম।

মাটির দেওয়াল। বেড়া দিয়ে ঘেরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন খানিকটা জমি মনে হলো গোবরমাটি দিয়ে লেপা। কিছু কিছু গাঁদাফুলের গাছ। বড় ভাল লাগলো। মনে হলো কোন সুরুচিসম্পন্ন পরিবারের সঙ্গে আলাপ হবে, হলেই বা দরিদ্র। কিছুটা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম। ঢোকার দরজাটা দেখলাম প্যাকিং বাক্সের কাঠ দিয়ে তৈরী। রীতিমত কব্জা লাগানো। দরজা ভেজানো। ঠেলে খুলতেই কঁ্যাচ করে আচমকা একটা আওয়াজ। তারপরই যেই ঢুকতে গেছি মনে হলো ভেতরের দুর্গন্ধ ভ্যাপসা বাতাস যেন আমাদের ধাক্কা দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে এল।

পেট্রোম্যাক্স বাতিটা দরজার পাশে রেখে ঢুকেছিলাম। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি বোস নাকে রুমাল গুঁজেছে। দু-পা এগিয়ে গিয়ে দেখি ঘরের এক কোণায় দড়ির আলনায় কয়েকটা ময়লা কাপড়-জামা ঝুলছে। আর এক কোণায় একটা উঁচু মাচা। তার উপর একটি দেহ। দুর্গন্ধটা আসছে সেদিক থেকে। আরও দেখতে পেলাম একটা কপাটহীন দরজার ওধারে আর একটা ঘর। তার মধ্যে একটা ছোট লণ্ঠন জ্বলছে, চিমনির কাচটা ধোঁয়ায় কালো। বোসকে আমাদের জোরালো আলোটা ঘরের মধ্যে আনতে বলে আমি একটা ভাঙা প্যাকিং বাক্সের উপর ভর করে মাচায় উঠতে গেলাম। আমার ভারে রোগিণীর দেহসমেত মাচা কাত হয়ে বেঁকে গিয়ে আমার ঘাড়ে এসে পড়লো। সবসুদ্ধ জড়িয়ে ধরে লাফ দিয়ে নামলাম। বোস ছুটে এসে ধরে ফেললো। রোগিণী তখন জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ। কিছু টের পেলো বলে মনে হলো না। তার গা থেকে আগুন ছুটছে। দুর্গন্ধে আমার সমস্ত শরীরটা ভরে গেল। চিৎকার করে গোমেসকে বললাম, "হাঁ করে দেখছো কি? হেল্প—", সে কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মাঝে বসে পড়লো। বোস মাচার ডাল-গুলোকে দাঁড়ের উপর সাজিয়ে আলনার দড়ি খুলে বেঁধে দেওয়া পর্যন্ত আমি দেহটাকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

রোগিণীর জীর্ণ দেহ শিশুর মত হাল্কা হয়ে গিছলো। শুইয়ে রেখে যথারীতি নাড়ী দেখবার অভিনয় করলাম বটে কিন্তু মনে হলো রোগ কঠিন। হোমিওপ্যাথি গুলিতে কিছুই কাজ হবে না। নেমে এসে বোসকে বললাম, "গোমেসকে বল ময়লা দুর্গন্ধ বিছানাপত্র ফেলে দিয়ে শরীরটাকে বেশ করে ঠাণ্ডা জলে ধুইয়ে দিতে। তুমি ততক্ষণ আড়ালে গিয়ে গরম জল তৈরি কর। কেরোসিন-এর খালি টিন, পাথর, কাঠ সবই তো আছে দেখছি। পথ্য তৈরি

করতে হবে—সেটাই হচ্ছে আসল।"

গোমেসকে এক ধমক দিতে ও উঠে দাঁড়ালো। বললাম, "ব্র্যাণ্ডি থাকে তো চট্‌পট করে বার কর, টিনের দুধও লাগবে।"

সে নিজের কপালে চপেটাঘাত করে ইংরিজি উর্দু মিশিয়ে বললে, "কোথায় পাবো ওসব জিনিস? পেট ভরে খাওয়াই জোটে না—"

কথা থামিয়ে দিয়ে বোসকে বললাম, "কাঁদুনি শোনবার সময় নেই—আমি চললাম টিমার কাছে—দেখি কি যোগাড় করা যায়! দেখো ঠাণ্ডা জলে চুবিয়ে স্নান না করালে জ্বর কমবে না।"

দেখলাম বোস একটু সঙ্কটে পড়েছে। বললাম, "নালার ওপারে তো ঠিকাদারদের হাটিংস আছে। গোমেসকে বল একটা রেজা ডেকে আনতে।"

আর বিলম্ব না করে আমি গোমেস-এর লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে পাহাড়ে ওঠার পথ ধরলাম।

বোসের মহৎ গুণ সে চেষ্টা থেকে বিরত হয় না। তাছাড়া আমার উপস্থিত বুদ্ধির উপর ওর অগাধ বিশ্বাস। কোনো প্রতিবাদ করলো না।

আমি সরাসরি ম্যানেজারের তাঁবুর দিকে না গিয়ে টিমাকে ঘুম থেকে তুললাম। সে বললে, "টিনের দুধ এখনই দিতে পারি কিন্তু হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি তো সাহেবের তাঁবুর মধ্যে—ওদিকে যাওয়া বারণ। জানেন তো গুলি করে দিতে পারেন।"

বললাম, "যেখানে মানুষের জীবন নিয়ে টানাটানি সেখানে কিছু দুঃসাহসের দরকার হয়। বেশ তো আমিই যাচ্ছি, কেসটা কোথায় থাকে জানি। বাতিটা রেখে গেলাম। দুধের টিনটা খুলে রেখে দিও—এক্ষুনি ফিরবো।"

তাঁবুর কাছাকাছি যেতেই সাহেবের প্রবল নাসিকাগর্জন কানে এল। তাঁবুর পর্দা তোলাই ছিল। আসবাবপত্র সবই আমার পরিচিত। ক্যাম্পখাট ঘিরে কাঠের টেবিলের উপর রাখা অস্ত্রশস্ত্র অনেকবার নাড়াচাড়া করেছি। একটা ছোট লণ্ঠন জ্বলছে এক কোণায়। তার অল্প আলোতে দেখতে পেলাম মদের বাক্স। একটা খোলা খানিকটা খাওয়া বোতল দাঁড় করানো ছিল পাশেই। সেটা খুব সন্তর্পণে তুলে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলাম।

টিমা কিছুটা এগিয়ে এসে অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। চুপিচুপি বললে, "আর কোন দিন এভাবে যাবেন না।

সাহেব সত্যিই গুলি করে দিতে পারেন—ঘুমের ঘোরে ওঁর মাথার ঠিক থাকে না—কিন্তু আপনার হাতে তো দেখছি হুইস্কির বোতল—ব্র্যাণ্ডি চাইছিলেন না?"

বললাম, "একই কথা—কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে—এই সিকি খাওয়া বোতলটা কেসের বাঁ দিকে আলাদা রাখা ছিল—সেখানে আর একটা বোতল রেখে দিও—সাহেব যেন টের পান না—"

টিমা ঠিক হ্যায় বলে কিছুটা পথ সঙ্গে গিয়ে নালার ধারে যাওয়ার আরও গড়ানে আর একটা সোজা পথ দেখিয়ে দিল। চট করে পৌঁছে গেলাম। দূর থেকেই দেখা গেলো তিনটে বড় বড় পাথর সাজিয়ে উনুন তৈরি করে বোস আগুন জেলে জল চড়িয়েছে। আমি কাছে যেতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "গোমেস সেই যে বসেছে একবারও ওঠেনি। হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে গেছে, একটা কথাও কানে নিচ্ছে না। আমি জল চড়িয়ে রেজা ডাকতে গিছলাম, কিন্তু বস্তি থেকে কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না। হাট থেকে মদ খেয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। ঠিকাদার তেজ বাহাদুরের খোঁজ করলাম, পেলাম না—তবে আর একটা খালি টিন যোগাড় করে এনেছি—"

বোস আর আমি ধরাধরি করে সেই টিনে করে নালার ঠাণ্ডা জল তুলে এনে রোগিণীর মাথা ধুইয়ে, আলনা থেকে ফেলা জামাকাপড়ের স্তূপ থেকে একটা যাহোক তুলে, তাই দিয়ে মুছিয়ে দিলাম। গোমেস এবার উঠে এসে দুটো ঘরের মাঝের দরজাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কান্না জুড়ে দিল।

ধমক দিয়ে থামাতে না পেরে আমি বোসকে বললাম, "এটা একরকম হিস্টিরিয়া, ওকে নিয়ে পড়লে চলবে না—আরও পেয়ে বসবে—তুমি বাকি জলটার সঙ্গে অল্প একটু গরম জল মিশিয়ে দাও—হাত-পাগুলো একটু মুছিয়ে দি—"

এবার সাবধানে মাচায় উঠে বসে গোমেস-এর একখানি হাফ্‌প্যান্ট ভিজিয়ে রোগিণীর মুখ, হাত, পা যত্ন করে মুছিয়ে দিলাম। মনে হলো আমার স্পর্শে সংজ্ঞাশূন্য শরীরের মধ্যে যেন চেতনার সঞ্চার হলো। কোটরের গভীর থেকে ঘোলাটে চোখ দুটি আমার মুখের প্রতি নিবদ্ধ। কিছু যেন বলতে চায়। সে ধারণা আমার মনগড়া হতে পারে তবে আমি নেমে যাওয়ার সময় দেখলাম চোখের পাতা ধীরে ধীরে নেমে আসতে মুখের শ্রী প্রশান্ত হয়ে গেলো। শ্বাস-প্রশ্বাস অনেকটা সহজ হয়ে এল।

বাইরে এসে যখন টিনের গরম জলে হুইস্কি আর টিনের দুধ গুলছি তখন দেখি

গোমেস এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। ওকে আশ্বাস দিলাম যে দুর্বলতা কেটে গেলে ওর স্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠবে। বললাম, "এটা ঠাণ্ডা হোক তারপর দশ মিনিট অন্তর মুখের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা দিয়ে দেখো। সকাল নাগাদ জ্ঞান ফিরে এলে খাওয়ার মাত্রা একটু বাড়িও। কাল এসে আরও ভাল করে পরিষ্কার করে দেওয়া যাবে। দুজন রেজা পাঠিয়ে দেবো।"

ফেরার পথে বোসকে বললাম, "ভেতরের ছোট ঘরে আর কোনও মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছিল। কে যেন গুমরে গুমরে কাঁদছিল। আমরা কাছে যেতে গোমেস দরজা আগলে হাউমাউ করে উঠলো সেই আওয়াজটা ঢেকে দেবার চেষ্টায়। তুমি কি টের পেয়েছিলে?"

বোস উত্তর না দিয়ে ঘাড় হেঁট করে এগিয়ে চললো। বুঝলাম একটা কোন রহস্য আছে।

ক্যাম্পে ফিরে দুর্গন্ধ কাপড়-চোপড় ছেড়ে তোলা জলে স্নান সেরে বোসকে চেপে ধরতে সে বলল, "ঘাসিরামের কাছে শুনেছি, সত্যি-মিথ্যা জানি না!"

"কি শুনেছো?"

"গোমেস দাঁত তুলিয়ে আনবার নাম করে ছুটি নিয়ে খড়গীপুর যায়। সেখান থেকে কাকে যেন নিয়ে এসেছে—তারপর দুজনে মিলে রুগ্ন বউটাকে—"

বললাম, "থাক্, ওই উড়ো কথায় কান না দেওয়াই ভাল তবে একটু খোঁজ নিলেই পারতে—"

"তেজ বাহাদুরও সেই কথাই বলেছে—ও তো ঝগড়াঝাঁটির জ্বালায় বাসা বদল করে উঠে যেতে বাধ্য হয়—"

"এত কাণ্ড হচ্ছে অথচ আমি তার কিছুই জানি না—ম্যানেজার সাহেব জানেন?"

বোস বললে, "আপনি জেনে কি করতেন? ডাক্তারী ছেড়ে কি জজিয়তি করতেন? কে ওর সত্যিকারের বউ, কিম্বা দুজনের মধ্যে একজনেরও বিয়ে হয়েছে কিনা, সে-সব খবর কার কাছে পেতেন? পেলেও বিহিত করতেন কি?"

এই প্রথম বোসের কাছে তর্কে হেরে গেলাম, আর কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে বললাম, "তা বলে চোখের সামনে মানুষ খুন হয়ে গেলেও কি হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? কিছু করা যাবে না? ননসেন্স! কাল সকালেই যা হোক একটা কিছু করতে হবে।"

বোস শুয়ে পড়ে ক্লান্ত কণ্ঠে বললে, "সকাল হবার আর দেরি নেই। আগে

একটু ঘুমিয়ে নিন। যাই করুন, এ্যালেন সাহেবের কানে কথাটা তুলতে যাবেন না।"

"কেন?"

"উনি বলবেন, মাইণ্ড ইয়োর ওন বিজনেস্ ল্যাডি—কেমন শুনতে লাগবে? শেষকালে ডাক্তারী করাও বন্ধ করে দেবেন।"

পরদিন সকালে আমরা সাতটার মধ্যেই যে-যার কাজে গেলাম। ভোরের আলোতে শরীর আর মনের গ্লানি অনেকখানি কেটে গেছে। কেবল মনে পড়ছে মেয়েটির জরক্লিষ্ট মুখখানা, আধময়লা রঙ, চোখা-চোখা নাক আর চোয়ালের হাড়, ঘন ভুরু।

খবর নিয়ে জানলাম গোমেস সেদিন কাজে যায়নি। কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। ভাবলাম এক ফাঁকে গিয়ে দেখে আসবো।

খাতাপত্র তুলে রেখে ওঠবার উপক্রম করছি এমন সময় বোসের লোক মারফৎ খবর পেলাম যে গোমেস-পত্নীর মৃত্যু ঘটেছে আর আমার তৈরি ওষুধের সবটা খেয়ে নিয়ে শোকাবিষ্ট গোমেস বটগাছের তলায় হেলান দিয়ে বসে বিশ্বসুদ্ধ লোককে গালিগালাজ করছে।

ম্যানেজার সাহেবের ঢালা হুকুম ছিল যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যাপারগুলির দায়িত্ব আমার। আমাকে বিশেষ ভাবে বলা ছিল যে যতদিন না ম্যাঙ্গানিজের আকরগুলোকে ভাল করে খুঁজে দেখা হয় ততদিন কবর দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কোম্পানির ইজারা নেওয়া এলাকার বাইরে। আদিবাসীরা অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা গ্রাহ্য করতো না। তারা কাছাকাছি কোনও গাঁয়ের পাশে স্বজাতিদের গোরস্থান করে সেখানে সমাধির ব্যবস্থা করতো। যেখানে সেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের ফলক দেখা যেত।

এই প্রথম এক প্রবাসী ভারতীয় খ্রীশ্চানের মৃত্যু ঘটেছে বলে আমি একটু মুশকিলে পড়লাম। কবর দেওয়ার আগে কোনও অনুষ্ঠানের নিশ্চয় দরকার অথচ গোমেস-এর সঙ্গে পরামর্শ করবো, তারও উপায় নেই। এত কষ্ট করে যোগাড় করা হুইস্কি যে শেষ পর্যন্ত গোমেস-এর ভোগে লাগবে সে কথা আমার জানা উচিত ছিল। এখন বক্সী জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না। সে হায় হায় করতে করতে সারা ক্যাম্পে বলে বেড়াবে। বোস যে বলবে না অবশ্য সে ভরসা ছিল কিন্তু টিমাকে ঠেকাবে কে?

ফিটার আর প্যাকারদের মধ্যে দুজন ছিলেন রাঁচির খ্রীশ্চান। তাদের ডেকে

পাঠিয়ে খানকতক প্যাকিং বাক্স দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলাম কফিন বানাতে হবে। বললাম, "যত লোক লাগে মেটদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাও। বিকেলে রোদ্দুরের ঝাঁজটা কমবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে যেতে হবে।"

আর একদলকে পাঠিয়ে দিলাম কবর খুঁড়তে—এদের দলপতি করে পাঠানো হলো কেশবাবুর মেটকে। ও ইজারা এলাকার সীমানা জানে। নক্সায় দাগ দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেওয়া হলো।

ম্যানেজার সাহেব ফিরেছেন শুনে আমি তাঁর অফিস তাঁবুতে হাজির হলাম। তাঁর মেজাজ দেখে ভাবলাম যে মদের বোতলের তিরোধান তখনও নজরে পড়েনি, কিন্তু আমাকে দেখেই বললেন, "ইট্ ইস্ ইয়োর ফিউনারেল—হোয়াই কাম টু মি ?"

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, "ওটা একটা ইডিআম্—আমার প্রেসাস্ হুইস্কির বোতল চুরি থেকে গোমেস-এর তুরীয় অবস্থা পর্যন্ত সব খবরই জানি—ফিউনারেলটা তোমার মানে বেরিয়ালের দায়িত্বটা তোমার। এবার বুঝেছি এর মধ্যে তুমি এমন জনপ্রিয় চিকিৎসক হলে কেমন করে—মুমূর্ষুকে স্বর্গে পাঠাবার খাসা ব্যবস্থা—", সাহেব হা হা করে হেসে উঠলেন।

টিমার উপর ভীষণ রাগ হলো। আমি ভেবেছিলাম ও ঐ জায়গায় আর একটা খোলা বোতল রেখে দেবে। সেই কথাই ছিল। উল্টে সব কথা বলে দিয়েছে।

এবার সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, "যাই কর, আমাদের এলাকার বাইরে হয় যেন।"

বললাম, "সে জানি, কিন্তু ক্যাম্পে আপনি ছাড়া আর কোনও শিক্ষিত খ্রীশ্চান নেই যে সৎকারের ক্রিয়াকলাপ জানে—সে দায়িত্ব আপনার। বিকেলের দিকে রোদ্দুরের তেজ কমে গেলে আমরা রওনা হব। বোকনা গাঁয়ের মজুরদের কবর খুঁড়তে পাঠানো হয়েছে, তাদের সঙ্গে গেছে আপনার শিকারী, কেশবাবুর মেট—সে সীমানা জানে।"

ম্যানেজার বললেন, "সে খবরও পেয়েছি কিন্তু আমি তোমাদের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবার উপযুক্ত সে কথা কে বললে ?"

বললাম, "আপনি খ্রীশ্চান—"

সাহেব আবার হেসে ফেটে পড়লেন, "ও মাই আণ্ট, হাও ভেরি ফানি—মি এ খ্রীশ্চান এ্যাণ্ড এ পাদ্রী টু বুট ! ছাট—"

হাসির দমকে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। সামলে নিয়ে সাহেব

তাঁর ক্যাম্পখাটের তলা থেকে একটা কালো রঙের চ্যাপটা ট্রাঙ্ক টেনে বার করলেন। তারপর হাঁটকে হাঁটকে একটা মলাট-ছেঁড়া বাইবেল বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "দেখ সিরিয়াসলি বলছি তুমি আমার চেয়ে অনেক বেশি উঁচুদরের খ্রীশ্চান। আমি আজকের অনুষ্ঠানে তোমাকে পাদরী নির্বাচিত করলাম—এসো মন্ত্রগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি—"

বইয়ের বিশেষ পাতাগুলোর কোণ মুড়ে আমি যখন ক্যাম্পে ফিরলাম তখন খাবার ঘরে সকলে জমায়েত হয়েছে। আমার কথা শুনে বোস বললে, "আমি একটু আগেই বলছিলাম সাহেব কখনই আসবেন না। কোনও রকম আনুষ্ঠানিক ব্যাপার উনি সহ্য করতে পারেন না।"

বক্সী বললে, "আমরা ঠিক করেছি জ্বর হলে আর কুইনাইন খাব না। আপনার ঐ ওষুধটাই সব চেয়ে ভাল।"

গোমেস জনপ্রিয় লোক না হলেও তার পত্নীবিয়োগ আর পরবর্তী প্রহসন সকল ক্যাম্পবাসীর মনেই আঘাত করেছিল। বক্সী তার ইয়ার্কির কোন সাড়া না পেয়ে নীরব হয়ে গেলো।

দেখলাম বিকেলবেলা গোমেস-এর কুটিরে জড়ো হওয়ার পর থেকে সব চেয়ে বেশি খাটাখুটি করলো বক্সী। আমার মনে হলো সে মুখে যাই বলুক না কেন এই মৃত্যুতে তারই আঘাত লেগেছিল বেশি করে। ওর মনটা বড় নরম।

প্যাকাররা গিয়ে দেখে মৃতদেহ আগলে বসে আছে গোমেস-এর একজন মেট। শুনতে পায় গোমেস নাকি অতিরিক্ত মদ্যপান করে গাছতলায় পড়ে আছে মড়ার মত নিঃসাড়ে। ঘরের মধ্যে মৃতদেহ ছাড়া দ্বিতীয় কোন লোককে দেখতে পায়নি তারা।

দেখলাম প্যাকিং বাক্সের কাঠ যোগাড় হয়েছে অপর্যাপ্ত কিন্তু পেরেকের অভাবে কফিনটা তৈরি হয়েছে বড় বড় ফাঁক রেখে। পশু-পক্ষী চালান দেওয়ার খাঁচার মত দেখতে হয়েছে অনেকটা। তখন আর কোনও ব্যবস্থা করবার সময় ছিল না। দিনের আলোতে দেখা গেলো যে রোগিণীর মল-মূত্র পর্যন্ত সাফ করা হয়নি শেষের কদিন।

বিছানাপত্র পুড়িয়ে দিয়ে নালার জলে হাত-পা ধুয়ে রওনা হতে কিছু দেরি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে গোমেস-এর সন্ধানে লোক পাঠিয়ে খবর পেলাম যে সে জামদার দিকে চলে গেছে। একদল লোক সেদিক থেকে ফেরবার সময় দেখেছে গোমেস হাঁটছে রেল লাইনের ওপর দিয়ে হাতে একটা বড় ব্যাগ নিয়ে আর তার

আগে আগে চলেছে একজন স্ত্রীলোক।

বক্সী বললে, "বলেন তো লোক পাঠিয়ে ওদের আটকাই। ব্যাটা মটকা মেরে পড়ে ছিল, সুযোগ বুঝে সটকে পড়েছে—দুটোতে মিলে নিশ্চয় বউটাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে—"

বোস বললে, "থামুন মশাই—আপনার এত মাথাব্যথা কিসের? লাশটাকে তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে ময়না তদন্ত করাবেন নাকি?"

সুকেশ বললে, "মানহানির মামলা বাধলে আমাদের হয়ত চাইবাসাতে গিয়ে সাক্ষ্য দিতে হতে পারে—মন্দ কী?"

এর পর বক্সী আর কথা বলেনি।

আমরা কবরের গর্তের কাছে পৌছলাম সূর্যাস্ত হওয়ার পরে কিন্তু তখনও সন্ধ্যা হতে অনেক দেরি। কেশবাবু নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে দেখালেন ঠিক জায়গায় খোঁড়া হয়েছে। আমি বাইবেলখানা হাতে করে এনেছিলাম। সকলকে গর্তের দুপাশে দাঁড় করিয়ে ধীরে ধীরে দেহটিকে নামিয়ে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ইংরিজি ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ করলাম। মাটির দেহ মাটিতে লীন হও ছিল তার মূল কথা।

সেখানে মাটি অবশ্য নেই। সবই কাঁকরের চাঙড। যেই প্রথম ঢেলাটি ফেলেছি অমনি উপরের কাঠ মুড় মুড় করে ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় তৃতীয় চাঙড় ফেলার সঙ্গে সঙ্গে একটা পোড়া কাঠের মত শীর্ণ হাত উপর দিকে ঠেলে উঠে যেন বিদায় নমস্কার জানালো। তারপর সবাই মিলে যেন ভয় পেয়ে পাথর ফেলে ফেলে ভরাট করে দিল গর্তটা।

উঁচু-নিচু পায়চলা পথ দিয়ে কফিনটা নিয়ে আসার সময় কম ঝামেলা হয়নি। ফাঁক দিয়ে হাত পা বেরিয়ে আসছিল বলে গাছের ডালপালা কেটে কেটে ঠেকা দিতে হচ্ছিল। মাথাটা এধার ওধার ঠিকরে ধাক্কা খাচ্ছিল।

ফিরতি পথে কোন বোঝাই ছিল না কিন্তু পূর্বরাত্রের সেই কোটরে ঢোকা চোখের ক্ষণিক দৃষ্টি আমাকে যেন পেয়ে বসলো।

ক্যাম্পের কাছাকাছি এসে ঠক্‌ঠক করে কাঁপতে লাগলাম। আমাকে টলতে দেখে বোস হাতটা ধরে ফেলে বললে, "উফ্, গা-টা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।"

সেই আমার প্রথম ম্যালেরিয়া জ্বরের অভিজ্ঞতা। মনে হলো শরীরের সমস্ত হাড় যেন কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে পড়তে চায়। বাকি পথটা কোনক্রমে

হেঁটে এসে জুতোজামা সুদ্ধ মাচায় উঠে যা কিছু হাতের কাছে পেলাম গায়ে চাপিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বোস আর বক্সী দুজনে মিলে কখন যে জুতো-জামা খুলে দিয়ে রাত-কাপড় পরিয়ে দিয়েছে জানতে পারিনি। জ্ঞান হারাবার আগের কিছু কিছু ঘটনা ও স্বপ্ন আবছা আবছা মনে আছে। কারা যেন আমাকে মাচা থেকে নামিয়ে মেঝের উপর শুইয়ে দিত, তারপর বোস যেন ঝুঁকে পড়ে বলতো মাথার কাছে জল রাখা আছে। একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড শালগাছে অদ্ভুত সুন্দর ফুল ফুটতো দিনকতক আগে। এখন দেখলাম সেই গাছের ডালে ডালে দোলনা ঝুলিয়ে অনেক জোড়া বামন আকারের সাহেব মেম অবিরাম দুলছে। আরও মজার ব্যাপার হলো দেওয়ালের ডালে ডালে ইঁদুরদের কাণ্ড। তারা কুচকুচে কালো রঙের চকচকে টপ্ হ্যাট পরে এসে আমাকে দেখে ঘাড় নাড়ে আর কি যেন বিড় বিড় করে বলে। তারা যেন আমার দুরবস্থা দেখে হতাশ হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম বোসের গলা। কাকে যেন বলছে, "ওয়ান হাণ্ড্রেড টুয়েন্টি টু ডিগ্রি ইন দি শেড—পাথরগুলো তেতে আগুন—রাত-দুপুর পর্যন্ত হিট্ রেডিয়েট করে—মহুয়াগুলো ক্যানভাসের ওপর পড়া মাত্র চুপসে শুকিয়ে যাচ্ছে—জ্বর কমবে কেমন করে?"

এই সব কথা যখন স্মরণ হয় তখন নিশ্চয় পুরোপুরি জ্ঞান হারাইনি।

তাছাড়া বোস যখন টিমার তৈরি সুরুয়া খাইয়ে কাজে চলে যেত তখন হাত বাড়িয়ে টিন থেকে নালার জল নিয়ে মুখে মাথায় দিতাম মনে আছে। কাছে তো কেউ থাকতো না!

বোস অবশ্য বলে যে তৃতীয় দিন থেকেই ভুল বকতে শুরু করি, তার পরদিন থেকে কোন চেতনাই হয়নি। সে নাকি ভয় পেয়ে একরকম জোর করে ম্যানেজার সাহেবকে ডেকে এনে দেখায়। তিনি দায়িত্ব না নিয়ে ইউসুফের পরিত্যক্ত ডুলিতে বেঁধে পাঠিয়ে দেন চালানবাবু বি. ব্যানার্জির হেপাজতে চাইবাসার হাসপাতালে। ব্যানার্জি বোসের গোপন নির্দেশমত সেই অচেতন রোগীকে হাসপাতালে না দিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে।

হঠাৎ একদিন দেখি কলকাতা শহরে ছোট ভাই-এর বাড়িতে শুয়ে আছি। স্বপ্ন নয়—সত্যি। সেই পরিচিত ঘর, আসবাবপত্র। লোহার রড বসানো জানালা। একটা অশ্বত্থ গাছের এক অংশ। বিজলীর তার। পাশে দাঁড়িয়ে মামাতো ভগ্নীপতি ডাক্তার কালীপদ ঘোষ ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ পরিষ্কার করছেন।

আর এক পাশে ছোট বোন উদ্বিগ্ন মুখে আমার দিকে তাকিয়ে। ভগ্নীপতি কাকে যেন ডাকলেন। দেখি আমাদের কোম্পানির চালানবাবু বি. ব্যানার্জি। তিনি ছিলেন চাইবাসার ফরওয়ার্ডিং এজেণ্ট—এখানে কি করছেন? ডাঙ্গোয়া-পোশিতে বদলি হওয়ার কথা কিন্তু এ তো কলকাতা—দুর্বল মাথায় সবই গুলিয়ে যাচ্ছিল।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে বসতে যাচ্ছিলাম। ছোট ভাই ঘরের এক কোণায় চেয়ারে বসেছিল। বললে, "বিছানা থেকে নেমো না, কালীবাবু এখুনি আসবেন।"

ব্যানার্জি আমার সাড়া পেয়ে ছুটে এলে তার কাছে শুনলাম সব কথা। সেদিনই বিদায় নিয়ে ফিরে গেলো সে। ক্যাম্পের সকলে, বিশেষ করে বোস উৎকণ্ঠিত হয়ে খবরের অপেক্ষায় আছে। ওর কাছে শুনলাম আমাকে যেদিন চাইবাসা পাঠানো হয় তার আগের দিন ঐ একই রোগে মেনিন্‌জাইটিস্ হয়ে পাঁচজন লোক মারা যায়। যারা গেছে তাদের নাম ব্যানার্জি বলতে পারলো না কিংবা ইচ্ছে করে বললে না।

ব্যানার্জি বাড়ির লোকের মত হয়ে গিছলো দুদিনের মধ্যে। ছিপছিপে ফরসা চেহারা। বয়সে আমার চেয়ে একটু ছোট হবে। খুব সপ্রতিভ। দূরে থাকতো বলে ওর সঙ্গে ভাল করে আলাপ হয়নি এর আগে।

ও চলে যাওয়ার পর আমি দু-তিনদিন মাত্র শয্যাশায়ী ছিলাম। ছোট ভাই এক ইংরেজ সওদাগরী অফিসে কোনও বড় সাহেবের স্টেনোগ্রাফারের কাজ করতো বলে ওর বাড়ি ফিরতে খুব দেরি হতো, বিশেষ করে বৃহস্পতিবারে। ছোট বোনকে শ্বশুরালয়ে ফিরে যেতে হয়। সারাদিন নিঃসঙ্গ থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। বাগবাজারের মুখুজ্যেপাড়ায় এক সরু গলির মধ্যে ভাড়া বাড়ি। একদিকে খোলার চালের বস্তি। গ্রীষ্মকাল তখন। ভোর না হতেই শব্দ শুরু হয়। কাক, চিল, পায়রা, রাস্তায় কলতলার কলহ, বাসনপত্রের ঝন্‌ঝনানি, ভিখারী ও ফেরিওয়ালার ডাক, ঝি-এর বাজখাঁই গলা, ঘুড়ি-পাগল ছেলেদের চিৎকার, বল হরি হরিবোল—উঠে হেঁটে বেড়াবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছি দেখে কালীবাবু পথ্য বাড়িয়ে দিলেন।

দুদিন পরে আমি তাঁর কাছে বিদায় নিতে গেলাম।

"সে কি? ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া—মাথার ঝিল্লী ফুলে একশা—মারা যাওয়ার দাখিল হয়েছিলেন—না আমি কখনই অনুমতি দিতে পারি না।

শরীরে বল পেতে আরও অন্ততঃ হপ্তা দুই সময় লাগবে—তাছাড়া জ্বরটা আবার ফুটে বার হতে পারে। হেড অফিসে গিয়ে দেখা করে ছুটি নিন। ওরা নিজেদের ডাক্তারকে দিয়ে দেখিয়ে নিক—"

আমি কোনও তর্ক না করে সেদিনই রাত্রের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে উঠে বসলাম।

॥ ১৭ ॥

পরদিন সকালে জামদা স্টেশনে গাড়ি বদল করে ডাঙ্গোয়াপোশি পৌঁছতে বেলা দুটো বেজে গেলো। চাইবাসাতে পেট ভরে খেয়ে নিই কারণ ব্যানার্জির গতিবিধি একেবারে অনিশ্চিত। সুবিধের মধ্যে রাত্রিবাস করতে হলে আর স্টেশন মাস্টারের শরণাপন্ন হতে হবে না। শুনেছিলাম ব্যানার্জি একটা ছোট কুটির বানিয়ে নিয়েছিল। গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখি সে উপস্থিত। আমাকে দেখে ছুটে এল। উত্তেজিত হয়ে বললে, "কি আশ্চর্য—আমি আজই সকালে বোসবাবুকে বলে এলাম—ফিরতে মাসখানেক সময় লাগবে। ডাক্তারবাবু তো সেই কথাই বলেছিলেন।"

আমি বাহাদুরি করে বেশ বড় দেখে একটা লাফ মেরে নামলাম। এখান থেকে বদল করে মালগাড়িতে গার্ডের কামরায় ওঠার কথা।

ব্যানার্জির লোকজনেরা আমাকে দেখতে এল। ভাবখানা যেন মরা মানুষ উঠে এসেছে।

ব্যানার্জি বললে, "কি অবস্থায় আনা হয়েছিল তা তো জানেন না? ক্যাম্পে তো গুজব আপনি হয়েই গেছেন!"

কয়েকটি খোলা গাড়িতে লোহালক্কড় আর স্লিপার নিয়ে একটি ট্রেন জামদা অভিমুখে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল। ব্যানার্জি তাইতে উঠিয়ে দিল। ড্রাইভার ও ফায়ারম্যানেরা বন থেকে কালোজাম সংগ্রহ করে এনেছিল। তাই থেকে আমাদের কিছু ভাগ দিয়ে গাড়ি ছাড়তে ছাড়তে চারটে বাজিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তাল বাতাস উঠে উত্তর-পশ্চিমের আকাশে ঘনঘটা করে এল। গার্ড বললে, "বেটার কাম ইন্‌সাইড—কালবৈশাখীর ঝড় হঠাৎ এসে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে—"

ব্যানার্জি আমাকে এই অন্ধ্রদেশীয় গার্ড সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিল। মদ্যপান করাবার জন্যে বড় ঝুলোঝুলি করে।

আমি বললাম, "বহুত ধন্যবাদ, কিন্তু আমি ঝড় দেখতে বড় ভালবাসি। লোহার রডগুলো ধরে থাকলে সাইক্লোন এলেও উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না—"

বিদ্যুতের ঝলকানি ক্রমশঃ কাছে এগিয়ে এলো। আকাশে ঘনঘটা করে অন্ধকার হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান এসে গার্ডকে ডেকে নিয়ে গেলো। যাওয়ার সময় গার্ড বলল, "আমরা তুয়ামুণ্ডির কাছে এসেছি। রেল কোম্পানির ঠিকাদারকে একটা ওষুধের পার্শেল পৌঁছে দিতে হবে—বৃষ্টি আসবার আগেই ফেরবার চেষ্টা করবো।"

যেভাবে দলবদ্ধ হয়ে ওরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলো তাতে মনে হলো কাছাকাছি কোথাও নেশা করার ব্যবস্থা আছে। আমার আপত্তি করার অধিকার ছিল না। আকাশের অবস্থা দেখিয়ে বললাম, "ঝড়বৃষ্টি এসে পড়লো প্রায়।"

বাতাসের এক ঝটকায় সেকথা কোথায় উড়ে গেলো। ওরা দুটি আলো নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

গার্ডের ছোট কামরার সবটাই প্রায় ভরে ছিল কাঠের সিন্দুক আর লোহালক্কড়ে। দুদিকে দুটি স্লাইডিং দরজার বাইরে একটি করে লোহার রেলিংঘেরা দাঁড়াবার জায়গা। আমার ট্রাঙ্কখানা ঘর থেকে বার করে এনে আমি খোলা বারান্দার উপর বসে গেলাম।

দু'চার মিনিটে যেন অন্ধকার জমাট হয়ে পাথরের মত এঁটে বসলো। তারপর বিদ্যুতের তরবারি উড়িয়ে দেবরাজ ইন্দ্র এসে সেই জমাট অন্ধকার কেটে কেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে লাগলেন। শব্দের নির্ঘোষে মনে হলো পৃথিবী রসাতলে চলেছে। জলের ঝাপট এসে লাগলো প্রবল বেগে। উঠলাম না। আশঙ্কার সঙ্গে অদ্ভুত আনন্দের অনুভূতি মিশে গিয়ে মনটাকে আবিষ্ট করে ফেলেছিল।

গার্ড কিংবা ইঞ্জিন-চালকদের দেখা নেই। প্রথম জলের ঝাপটের পর হু হু করে একটা কনকনে হাওয়া দিলো। আমার দুর্বল শরীরের প্রত্যেকটা শিরা সির-সির করে উঠলো। তারপর দেখতে দেখতে মুষলধারায় বৃষ্টি। সেরকম প্রবল দাপটের বৃষ্টি আমি জীবনে কখনও দেখিনি। মনে হলো যেন এই জমাট অন্ধ-কারকে জলের তোড়ে গলিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

কেন গার্ডের কামরার মধ্যে আশ্রয় নিলাম না সে-প্রশ্নের কোন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন উত্তর দিতে পারবো না। বোধ করি বাসি মদের মত কি একটা দুর্গন্ধ

নাকে এসেছিল যখন ট্রাঙ্ক নিয়ে আসতে ঢুকি। কিংবা অবচেতনলোক থেকে গাবুদার একটা কথা ভেসে উঠেছিল।

গাবুদা ছিলেন কোনও সদাগরী অফিসের সামান্য বেতনের কেরানী, কিন্তু রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীটের কুস্তির আখড়ায় তাঁর ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপ। স্বল্পভাষী অতি ভালমানুষ প্রকৃতির এই মানুষটির কাছে দিনকতক শাগরেদি করেছিলাম। আমরা থাকতাম কাছেই মুখুজ্যেপাড়ায়। মদনমোহনতলার মামার বাড়িতে যাতায়াত করার একটা পথ ছিল এমন সরু সরু গলিঘুঁজির মধ্যে দিয়ে যে দুজন সামনাসামনি হলে একজনকে দেওয়ালে পিঠ রেখে আর একজনের পথ করে দিতে হতো। একদিন অন্যমনস্ক হয়ে চলেছিলাম। বিপরীত দিক থেকে আসছিলেন গাবুদা। আমি পাশ দেবো সেকথা বোধ করি ধরেই নিয়েছিলেন, কিন্তু দিলাম প্রচণ্ড ধাক্কা। মল্লযোদ্ধার বুকের উপর আমার মত রোগাপটকা ছোকরার সংঘর্ষ ধর্তব্যের মধ্যে নেওয়া উচিত নয়, কিন্তু তিনি আমার দু'হাতের কনুই-এর উপর দিকের পেশী টিপে ধরলেন দৃঢ়ভাবে। আমি কোন রকম সঙ্কুচিত না হয়ে অবাক হয়ে দেখছিলাম কঠিন মাংসপেশীর সমাবেশ। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, "কে তুমি? তোমার নাম কি?"

বললাম, "স্যাণ্ডো—"

গাবুদা হেসে ফেললেন, বললেন, "রাক্ষসকে বলছো তুমি খোক্কস—"

বললাম, "ওটা আমার ডাকনাম—এ পাড়ায় আমি ঐ নামেই পরিচিত—"

এর পর যখন নিজের পরিচয় দিই মন্মথ বসুর ভাগ্নে বলে আর সেই সঙ্গে জানাই যে আমি যখন গাঁট্টাগোঁট্টা এক বছরের ছেলে তখন ইউজিন স্যাণ্ডো পূর্ব-আফ্রিকায় যায় বলে আমার ঐ নামকরণ হয়, তখন তিনি আমাকে ধরে নিয়ে যান তাঁর আখড়ায়। এক মাসের মধ্যে শরীরের মাংসপেশী নামের উপযোগী হয়ে উঠলো। একদিন কুস্তি লড়তে লড়তে এমন এক প্যাঁচে পড়ি যাতে পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া আর উপায় ছিল না—গাবুদা দূর থেকে লক্ষ্য করছিলেন. বলেন, "বিরুদ্ধ শক্তি এালমেণ্টাল হলেও মনের জোরে মাটি কামড়ে থাকবে—কিছুতেই নতিস্বীকার করবে না। মনটাই হচ্ছে আসল।"

জলঝড়ের প্রকোপ কমে গেলে মুহুর্মুহু বাজ পড়তে আরম্ভ হলো। ক্ষণে ক্ষণে বিপুল বনানীর চকচকে আর্দ্র দৃশ্য আলোয় আলোময় হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে পরমুহূর্তেই নিবিড়তর অন্ধকারে বিলীন হয়ে যায়। কাড়া-নাকাড়া বাজতে থাকে। ভয় হয় লোহার গাড়ি বিদ্যুৎ আকর্ষণ করলে আমার দেহ পুড়ে কাঠ হয়ে যাবে।

হঠাৎ গার্ডের গলার আওয়াজে চমক ভাঙলো, "সরি, বৃষ্টির জন্যে আটকে গিছলাম। আপনি দেখছি ভিজে গেছেন—কামরার মধ্যে আশ্রয় নিলেন না কেন?"

কণ্ঠস্বর আর মুখের দুর্গন্ধে বুঝলাম যে দেরি হওয়ার জরুরী কারণ ছিল। বললাম, "আশা করি ২৪২ মাইল পোস্ট পর্যন্ত পৌঁছতে পারবো—"

"সিওর, সিওর—" ; সবুজ আলো দেখাতে গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। বৃষ্টি থেমে গিয়ে মেঘের আড়াল থেকে একফালি চাঁদ দেখা গেলো। কোনও জঙ্গলী ফুল থেকে এক-একবার মধুর সৌরভ আসছিল। ঝিঁঝিঁ পোকা আর বেঙের অবিশ্রান্ত আওয়াজের সঙ্গে চাকার শব্দে ঘুমের ভাব এসেছিল এমন সময় প্রবল জোরে ঝাঁকুনি খেলাম। দেখি গাড়ি থেমেছে। গার্ড তার কামরার মধ্যে গভীর ভাবে নিদ্রামগ্ন। ফায়ারম্যান এসে বললে, "আপনাকে এইখানে নামতে হবে, কাটিংটা পার হয়ে এসেছি—এখান থেকে বার্ড কোম্পানির ক্যাম্পটা বেশি দূর নয়—"

লোকটি ভাল। বিছানা-বাক্স নামাতে সাহায্য করলো। ওর বাতিতে ঘড়ি দেখলাম, রাত এগারোটা বেজে গেছে।

রেলের সাইডিং দেখেই চিনতে পারলাম। দুটো ম্যাঙ্গানিজ বোঝাই গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। ভাবলাম ওগুলোর নিচে আশ্রয় নেওয়া হবে সব চেয়ে নিরাপদ। পাথরের উপর বিছানা বিছিয়ে নিলে তেমন খোঁচা লাগবে না। ট্রাঙ্ক পড়ে রইলো। বেড রোলটা খুলতে যাচ্ছি হঠাৎ চোখে পড়লো ওদিকে একটি আনকোরা নতুন তাঁবু। মানুষের সঙ্গ পাবো বলে ভরসা পেলাম। কৌতূহল হলো কে হতে পারে? হেমবাবুর তাঁবু আরও অনেক বড় আর পুরনো।

দুদিকের মাটি কেটে অনেকখানি উঁচু করে এদিকের রেলপথ তৈরি হয়েছিল তারপর আবার কাটিং। হাঁটুজল ভেঙে তাঁবুর দিকে যেতে গিয়ে একবার গর্তে পড়লাম। ফিরে এসে আরও কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে গাদা করা স্লিপার্স পেয়ে তার উপর দিয়ে উঠে নেমে গেলাম। দূর থেকে দেখলাম সেই তাঁবুর সামনে দু'তিনজন মানুষ লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে। কাছে যেতে তাদের আর দেখতে পেলাম না। হাঁক দিলাম, "কে আছেন? খুলুন। আমি বার্ড কোম্পানির ঘোষ।"

কোন সাড়াশব্দ নেই অথচ ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর মধ্যে একঝলক আলো সরে যেতে দেখেছিলাম। আশ্চর্য হয়ে হাত বাড়িয়ে পর্দার ফাঁস খুলে ঢুকে পড়লাম।

দেখি একজন আমার পরিচিত চৌকিদার হারাক বাহাদুর আর দুজন

অপরিচিত লোক। মনে হলো আমাকে দেখে ভীষণ ভাবে ভয় পেয়েছে। বাহাদুর লণ্ঠন হাতে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। ওকে প্রশ্ন করলাম, "আমাকে চিনতে পাচ্ছ না? এরা কারা?"

এবার দুজনের মধ্যে যে তরুণ সে এগিয়ে এসে বললো, "আমরা বেঙ্গল টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানির লোক, কাছাকাছি রিজার্ভ ফরেস্টের একটা কূপ দেখছিলাম—আমাদের এই চৌকিদার আগে বার্ড কোম্পানিতে কাজ করতো। সেদিন খবর দেয় আপনি মারা গেছেন—এখন ঘুম থেকে তুলে বললে, আপনার প্রেতাত্মা আকাশ থেকে নেমে এদিকে আসছে—ও নিজের চোখে দেখেছে স্লিপারের গাদার ওপর দাঁড়িয়ে—দু'হাত তুলে—"

বললাম, "ভীষণ পিছল, ব্যালেন্স করছিলাম—"

হারাক বাহাদুর বললে, "হুজুর, আমার দোষ নেই, উলিবুরু ক্যাম্পে সকলেই ঐ কথা বলছে, তারপর এত রাত্রে দেখলাম—"

দেখলাম তাঁবুর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান হওয়া সম্ভব হবে না। হারাক বাহাদুরকে প্রশ্ন করে জানলাম সে পিছনদিকে একটি ডালপালার কুটীর তৈরি করে নিয়েছিল কিন্তু সন্ধ্যার ঝড়ে ছাদ উড়িয়ে নিয়ে গেছে তবে আরও মাইলখানেক দূরে কোম্পানির চালানবাবুর রাত্রিবাসের একটা ঘর আছে—রেল লাইন ধরে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

আমি চললাম সেদিকে রেল লাইন ধরে। বাহাদুর সঙ্গে আসতে ইতস্ততঃ করছে দেখে আমি বললাম, "তোমাকে আসতে হবে না—"

মিনিট কুড়ি পরে একটি ঘর দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে দেখি তালাবন্ধ। বাইরে একটা পাথরের ওপর বসে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

। ১৮ ।

জিওলজিস্ট হেনরী ডে উলিবুরুর দক্ষিণে প্রায় মাইল সাতেক দূরে ভদ্রাসাই অঞ্চলে কাজ করতে করতে গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে কলকাতায় চলে যান। তারপর আবির্ভূত হন একজন প্রাক্তন সামরিক অফিসার। নাম মেজর জে এইচ মার। চওড়ায় আমার দেড়গুণ। লম্বায় বড় জোর পাঁচ ফিট। মাথার চুল সাদা।

খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা। মেজাজে একেবারে মিলিটারি। 'তিরিক্ষি' কথাটি সেই সময়ে শিখি। বোস বলেছিল। সে আরও বলে যে যতদিন পৃথিবীতে একজনও ফরাসী মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন মেজর সাহেবের মুখে হাসি ফুটবে না। বোস চিঠি টাইপ করতো। অনেক কিছু গোপনীয় খবর রাখতো। কিন্তু এই লোকটির প্রকৃত দায়িত্ব যে কি সেকথা জানতে পারেনি। ভূতত্ত্ব অথবা মাইনিং সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই নেই, অথচ এক হাতে একটি ব্যাটন ও এক চোখে একটি রিম্‌লেস চশমা পরে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে সব কাজের পর্যবেক্ষণ করে বেড়াতেন। ঠিকাদার ও সুপারভাইজাররা উঠে দাঁড়িয়ে সামরিক কেতায় স্যালুট না করলে নাকি বেজায় চটে যেতেন।

একদিন খেতে এসে বক্সী বললে যে সে এ্যালেন সাহেবকে হাসিয়ে দিয়েছে। আমরা সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, "বলেন কি ? কেমন করে এ অঘটন ঘটলো—বলুন বলুন !"

বক্সী বেশ রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে পারতো। বললে, "মশাই আমি কি জানি অত সকাল সকাল মেজর সাহেবকে নিয়ে ম্যানেজার আমারই খাদানে হাজির হবেন—হঠাৎ দেখি মেটেরা ছুটোছুটি করছে আর পিছনে দুই মূর্তিমান উপস্থিত। ঘুরে দাঁড়িয়ে গুর্খা চৌকিদারের মত গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকতে গেছি, অমনি একখানা চটি পা থেকে বেরিয়ে পাখির মত উড়ে গিয়ে নিচের খাদানে পড়লো। দেখি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার সাহেব হেসেই অস্থির। মেজর সাহেব কিন্তু সে-সব কিছু লক্ষ্য করেননি। তিনি আমাকে স্যালুট করার কায়দাটা শিখিয়ে দিলেন। ঠিকাদার সাজ্জাদ আলী দূর থেকে দেখেছিল। ও ব্যাটারা চলে গেলে কাছে এসে বললে, আমি নাকি বুক ফুলিয়ে কুনিশ করেছিলাম।"

ফরাসী জাতির প্রতি এই লোকটির এত বিদ্বেষের কারণ জানবার জন্যে আমার কৌতূহল হলো। এক ফাঁকে অ্যালেন সাহেবকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "হোয়াই ডোণ্ট ইয়ু আস্ক্ হিম্—"

মেজর সাহেবকে আমি এড়িয়ে চলতাম। এক মতলব মাথায় এল। ভীম বাহাদুরকে চৌকিদারের পদে বহাল করবার সময় শুনেছিলাম যে সে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিল। আমাকে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখায়। তাকে শিখিয়ে দিলাম পরের দিন মেজর সাহেব এদিক দিয়ে গেলে ও যেন লম্বা স্যালুট ঠুকে, "গুড মর্নিং জেনেরাল" বলে হাঁক ছাড়ে। সাহেব হয়তো খুশি হয়ে দুটো কথা

বলবেন। তখন সে যেন ফ্রান্সের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা বলতে বলতে খুব কষে ফরাসীদের গালাগালি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবও হয়ত নিজের ফরাসী বিদ্বেষের কারণ ব্যক্ত করে ফেলতে পারেন।

ভীম বাহাদুর চালাক লোক। ও বুঝেছে মেজর সাহেবকে খুশি করতে পারলে স্পেন্সর সাহেবের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পেতে পারে।

স্পেন্সর-এর কঞ্জুসপনার অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। ভীম বাহাদুরের বন্দুক ছোঁড়ার হাত ভাল ছিল বলে স্পেন্সর এদিকে কোথাও ক্যাম্প করলেই ওকে চেয়ে নিতেন। সাহেব গুনে গুনে দুটো মাত্র টোটা দিয়ে হুকুম করতেন কমসে-কম দুটো বনমোরগ আর একটা ময়ূর আনা চাই-ই চাই.—না আনতে পারলে ফাইন। কদিন আগে জরিমানা বাবদ ভীম বাহাদুরের এক জোড়া নতুন অ্যাম্যুনিশান বুট তিনি কেড়ে নেন।

ভীম বাহাদুরকে বললাম, মেজর সাহেবের সমর্থন পেলে স্পেন্সর সাহেবকে তোয়াক্কা না করলেও চলবে।

আমার চক্রান্ত কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি। মেজর সাহেবের মেজাজ সেদিন ভাল ছিল না। ভীম বাহাদুরের স্যালুট ও সম্মানজ্ঞাপক ভাষণ তিনি তাঁর প্রাপ্য বলে ধরে নিয়ে গলায় ঝোলানো পাঁসনে চশমাটা চোখে লাগিয়ে বেতের ছড়িটা তার বুকের উপর ঠেকিয়ে বলেন, "ওয়ান বাটন ইস মিসিং—"

একদিন বোস কাজ থেকে ফিরে এসে খবর দিল অ্যালেন সাহেব বোধ হয় চলে যাবেন। তাঁর বড় ভাই বি. বি. সি. আই. রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারকে নাকি সেই রকম ইঙ্গিত দিয়ে চিঠি লিখেছেন। তাছাড়া মেজর মার রিপোর্টে সই করতে শুরু করেছেন। আমাদের দুজনেরই মন খারাপ হয়ে গেলো। সেই থেকে মার সাহেব আমার স্টোরের দিকে এলে আমি কোন কাজের ছুতা করে চলে যেতাম অন্য কোথাও। একদিন শুনলাম মেজর মার এক গোপনীয় চিঠিতে কলকাতার বড় সাহেবকে জানিয়েছে যে আমার কাজে মন নেই। আড্ডা দিয়ে বেড়াই।

বোসকে বললাম, "তবু ভাল আমার কথা উল্লেখ করেছেন—তুমি মন খারাপ করছো কেন ?" কথা বলতে বলতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এল।

কলকাতা থেকে দু-শিশি কুইনাইন মিকশ্চার করিয়ে এনেছিলাম। তার মধ্যে দেড় শিশি ইতিমধ্যেই ডাক্তারি করতে গিয়ে খরচ করে ফেলেছিলাম। বাকিটা খেয়ে তখনকার মত জ্বর চাপা দিলাম বটে কিন্তু কদিনের মধ্যে আবার দুর্বল হয়ে গেলাম।

অ্যালেন সাহেব চলে যাচ্ছিলেন। বোস তাঁকে কি বলেছিল জানি না। শুনলাম আমার বদলি সুপারিশ করে চিঠি দিয়েছেন। উগ্রমেজাজী মেজর সাহেবের সঙ্গে আমার যে কোন দিন সংঘর্ষ লেগে যেতে পারে সেই ভয়ে বোস ঝুলোঝুলি করে আমাকে দিয়েও দরখাস্ত করিয়ে নিল। কদিন পরে চিঠি এল হেড অফিসের অ্যাকাউণ্টস্ বিভাগে আমার জন্যে একটি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। যত শীঘ্র পারি যেন চলে যাই।

যাবার সময় জানতে পারি যে এখানকার হিসাবরক্ষার কাজেই আমাকে বহাল করা হবে সুতরাং দরকারমত পুনঃপুনঃ আসতে হতে পারে। ক্যাম্পবাসীদের সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা সবই আমার জানা আছে, সুতরাং খোদ কর্তাদের কাছেই দরবার করতে পারবো আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিলাম। তখন ভাবিনি যে এই সুদূর দুর্গম জঙ্গলে অসহায় সহকর্মীদের সঙ্গে ভয়-ভাবনা দুঃখ-কষ্ট ভাগাভাগি করে থাকার সঙ্গে পারদর্শক হিসেবে আমার মধ্যে অনেকখানি তফাৎ।

সেই পুরনো স্বচ্ছন্দ সম্বন্ধ আর ফিরে আসবে না।

॥ ১৯ ॥

বিরাট অফিস। বার্ড্ ও হ্যায়েলগার্স দুই সংস্থার যুগ্ম প্রয়াস—অনেকগুলি কয়লার খনি, পাট ও কাগজ তৈরির কারখানা, বীমা ও জাহাজ কোম্পানির এজেন্সি, ইঞ্জিনীয়ারিং কারুশালা, বন্দরে বন্দরে শ্রমিক নিয়োগের একচেটিয়া ঠিকাদারী, বিজ্ঞানের গবেষণাগার, আমদানি-রপ্তানির বিপুল উদ্যম—কেবলমাত্র হেড অফিস চার্টার্ড্ ব্যাঙ্ক বিল্ডিংস-এ প্রায় আটশ' লোক খাটছে।

এহেন জনসমুদ্রের মধ্যে আমার মত নগণ্য এক ছোকরার প্রবেশে অণুমাত্রও আলোড়নের সৃষ্টি করবার কথা নয়, কিন্তু প্রথম দিনই প্রশ্ন উঠলো বেতন তো পাই সামান্য একশ' টাকা, অঙ্গের বর্ণও শ্যাম, পোশাক অমসৃণ, অথচ ক্রাউন কলোনিতে জন্ম—নাম উঠবে কোন্ খাতায়? ইউরোপীয়, না ভারতীয়?

নির্দেশ এলো আমাকে ইউরোপীয় কোঠায় ফেলা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আমার আর অন্য সাধারণ ভারতীয় সহকর্মীদের মধ্যে একটা বিচ্ছেদ এসে গেলো। আমার দ্বিগুণবয়সী অধিকতর শিক্ষিত, তিনগুণ বেতনপ্রাপ্ত ওজস্বী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বড়বাবুর কাছে গেলে উঠে দাঁড়াতে শুরু করলেন। হিসাব বিভাগের সব চেয়ে

সম্মানিত বড়বাবু জীবনকৃষ্ণ পাইন মহাশয় পর্যন্ত যখন কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন করলেন তখন আমি বিচলিত হয়ে আমার মাতুল অধ্যাপক মন্মথ বসুকে বললাম। তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন, "তোকে তো খাতির করবেই, তুই তো ব্রিটিশ বর্ন্।" সেই থেকে ছুটির দিন হলেই আমাকে নিয়ে ভারতীয় জার্নালিস্ট এসোসিয়েশান ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থায় নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন।

কদিন যেতে না যেতে আমি আরও তিন-চারজন বাঙালী সাহেবকে আবিষ্কার করলাম বার্ড্ ও হায়েলগার্দ কোম্পানির দপ্তরে। একজন ছিলেন আইনজ্ঞ ও শেয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ, বাকি সকলে পারিবারিক প্রভাবের জন্য অফিসারপদে প্রতিষ্ঠিত। সকলেই আমার চেয়ে বহুগুণ বেশি বেতন পান। আমার সেজন্য দুঃখ ছিল না। মধ্যাহ্নের আহার জুটতো বিনা পয়সায়। ভোগ্যবস্তুর বৈচিত্র্য ও পরিমাণ মনে হতো রাজকীয়। সে-যুগে বাণিজ্যে লাভ হতো অপরিমিত আর পাটকলের সাহেবদের অফিসে আটক রাখার উদ্দেশে মদ্যপানের ব্যবস্থাও মজুদ থাকতো। আমি অবশ্য সে সুবিধা নিইনি, কিন্তু আমার অধিকার আছে সেইটুকু জ্ঞানেই মস্তিষ্ক-স্ফীতির উপক্রম হতো।

ফুটবল খেলার মরশুমে অনেকের সঙ্গে আলাপ হলো। টীমের প্রায় সকলেই ছিল ইংরেজ অথবা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, কিন্তু পরিচালক ছিলেন জনৈক ভারতীয় অফিসার। একদিন কথায় কথায় জানতে পারলাম তিনি ছিলেন আমার দাদার সহপাঠী। স্কটিশ-চার্চ স্কুলে একসঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। যথাক্রমে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা দিয়ে বার্ড্ কোম্পানিতে চাকরি পান এবং অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে ইংরাজী উচ্চারণ রপ্ত করেন।

আমাকে উপদেশ দিলেন, অফিসের ত্রিসীমানার মধ্যে যেন কোন কারণেই বাংলা ভাষায় কথা না বলি। বললেন, "উন্নতি করতে চাও তো দেশী লোকেদের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক ছাড়া কথাই কইবে না—কাজের কথাও বলবে ইংরিজিতে।"

কলকাতায় এসে পালাজ্বর শুরু হলো। কালীবাবুর চিকিৎসাধীনেই ছিলাম কিন্তু কোম্পানির নিয়মমত মেজর স্থাণ্ডিস-এর কাছেও যেতে হতো। রক্তে হেমো-গ্লোবিন-এর ঘাটতি দেখে তিনি ছুটি নিয়ে দার্জিলিং যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। চীফ এ্যাকউণ্টেণ্ট-এর কাছে অর্থাভাবের কথা বলতে তিনি বেম্বল সাহেবের কাছে সুপারিশ করে এক মাসের বাড়তি বেতনও পাইয়ে দিলেন।

শৈলবিহারে গিয়ে নিজের সঙ্গতি অনুযায়ী মিত্র বোর্ডিং-এর তৃতীয় শ্রেণীর বোর্ডার হয়ে থাকলেও অদৃষ্টের যোগাযোগে কয়েকটি অপরূপ চরিত্র ধনী মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে হলো। সে অভিজ্ঞতা শহুরে বিদগ্ধ সমাজের স্বরূপ চিত্রণে কাজে লাগতে পারে। আমার জঙ্গল-জীবনের কাহিনী এখনও শেষ হয়নি।

ছুটির শেষে ফিরেই শুনলাম অভিজ্ঞ স্টোরকীপারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল এবং কর্মপ্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ও নির্বাচনের ভার পড়েছে আমার উপর। আরও শুনলাম ম্যাঙ্গানিজ বিভাগের নূতন ভারপ্রাপ্ত পার্টনার টার্লটন সাহেবের হুকুমে উলিবুরু ক্যাম্পের জন্য একটি বহনযোগ্য (পোর্টেবল্) টিনের বাড়ি তৈরি হচ্ছে কুমারধুবি কারখানায়; আর একটি খবর হলো লরী ও ল্যাঙ্কাস্টার নামে দুজন ফিরিঙ্গী শিক্ষানবিশকে উলিবুরু পাঠানো হচ্ছে।

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল পরিবর্তন অনিবার্য কিন্তু আমি কেমন যেন ভগ্নোদ্যম হয়ে গেলাম।

বোসের চিঠি পেলাম। মেজর মার-এর হুকুমে নাকি অনেক গাছ কাটা হয়ে গেছে। তবে একটা সুখবর হচ্ছে তিনিও শিগগীরই যাচ্ছেন।

এ্যাকাউণ্টস বিভাগে খনি-পরিচালনের পলিসি সম্বন্ধে কোন সংবাদ আসবার কথা নয়। তবে হিসাবরক্ষক বলে আমাদের দায়িত্ব ছিল অফিস ও স্টোরের কর্মী নির্বাচনের।

স্টার্ক সাহেব দরখাস্তগুলির মধ্যে একটি বেছে নিয়ে বললেন, "এই একজন মাত্র লোক দেখছি যে আসামের চা-বাগানে অনেক বছর কাজ করেছে। ম্যালেরিয়া আর ব্ল্যাকওয়াটারকে ভয় করবে না। দেখ তোমার কি মনে হয়।"

আমি তখন নেহাতই জুনিয়ার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট, এক ঘরে অনেকে বসি। সকলেরই নজর পড়লো দশাসই লোকটির প্রতি। উস্কখুস্ক তৈলহীন চুল। ফর্সা

গায়ের রঙ পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। একটি চোখ মনে হয় যেন ঈষৎ টেরা। চাহনি পাগলাটে। বয়স প্রায় চল্লিশ। স্বল্পভাষী অথচ স্পষ্টবক্তা।

লোকটি বিদায় নিতে আমি স্বস্থির বোধ করলাম।

একজন সহকর্মী রসিকতা করে বললেন, "কে কাকে ইণ্টার্ভিয়ু করলে বোঝা গেল না।"

"ছোট ক্যাম্পে এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোক কি থাপ খাবে?"

আমার এই প্রশ্ন শুনে স্টার্ক সাহেব একটু হেসে বললেন, "মদ খাওয়া অভ্যেস আছে বলে মনে হয়—তুমি ওখানে মিতাচারী সমিতি গড়ে এসেছ নাকি?"

বললাম, "তা নয়, তবে বড় বেশি ঘনিষ্ঠভাবে থাকতে হয় সকলকে—"

"ওকে টিনের বাড়ির একটা ঘর দিলেই হবে। পুরনো লোকেদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকবে না। কাজ নিয়ে কথা। পাঠিয়ে দাও—"

আমার আর কিছু বলার রইল না।

সপ্তাহ দুই যেতে না যেতে ক্যাম্পবাসীদের কাছ থেকে প্রবল নালিশ আসতে আরম্ভ হলো, "ও মশায়, করেছেন কি? কাকে পাঠিয়েছেন? লোকটা ফেরারী খুনী আসামী কিনা ভাল করে খবর নিয়েছেন কি?"

কেউ কেউ লিখলো, "লম্পট, মাতাল।"

বোসের চিঠির ভাষা সংযত হয়। সে কেবল বললে, "পাশের ঘরের দেওয়াল জুড়ে খাঁড়া আর ত্রিশূল ঝুললে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমবো কেমন করে বলুন।"

আমাকে লেখা বেসরকারী অভিযোগ ছাড়াও বড় সাহেবদের কাছে উড়ো চিঠি আসতে শুরু হয়েছিল। অগত্যা আমার প্রতি আদেশ হলো ব্যাপারখানা দেখে এস। এদিকে ম্যানেজার তাঁর গোপন চিঠিতে লিখেছেন, এতদিন পরে কাজের লোক পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

এবার ডাঙ্গোয়াপোশিতে গিয়ে শুনলাম স্টেশন মাস্টার মুদেলিয়ার ব্ল্যাক-ওয়াটার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছে। সেখানে কিছু কিছু পরিবর্তনও চোখে পড়লো। একটি দুটি নতুন সাইডিং বাড়ানো হয়েছে। ইট জড় হচ্ছে ঘর-বাড়ির জন্যে। বদল করে মালগাড়িতেই জামদা যেতে হলো। সেখানে দেখলাম একটি খড়ের ঘরে রেল কোম্পানির লোকেরা কাজ করছে।

ম্যানেজারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে আমি সাময়িকভাবে তাঁর দপ্তর ও

স্টোরের সম্পূর্ণ ভার নিয়ে হেড অফিসের প্রয়োজনমত খাতাপত্র ও ফর্ম-এর সংশোধন করতে পারি। উপরন্তু কোন কর্মচারীকে অনুপযুক্ত বিবেচনা করলে তার বরখাস্তর জন্যে সুপারিশ করবো।

মেজর মার এমন একটা ভাব দেখালেন যেন এই প্রথম আমাকে দেখছেন। শেকহ্যাণ্ড করে বললেন, "ডাঙ্গোয়াপোশিতে গাড়ি পাঠানো সম্ভব হয়নি কারণ বৃষ্টিতে কতকগুলি সাঁকো ভেসে গেছে। আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে লরী ও ল্যাঙ্কাস্টার-এর সঙ্গে।"

আমি বললাম, "আপনার স্টেনোগ্রাফার বোসের সঙ্গে একঘরে থাকবো—"

"বাট হি মেস-এস উইথ দি বাবুস—তোমার পক্ষে অকওয়ার্ড হবে—"

"হোক গে—", বলে আমি দপ্তরের দিকে চলে যেতে ছপাং করে আওয়াজ শুনে পিছন ফিরে দেখি মেজর সাহেব তাঁর ব্যাটনখানা টেবিলের উপর সজোরে আঘাত করে একটি নক্সার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

বোস পাশের তাঁবুতে টাইপ করছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আপনার সঙ্গে মেজর সাহেবের কথাবার্তা শুনছিলাম। হেড অফিসের চিঠি পেয়ে পর্যন্ত ক্ষেপে আছেন। তার ওপর বীরমিত্রপুর থেকে ডাফ্ সাহেব আসছেন, কিন্তু আপনার কি আমাদের সঙ্গে থাকাটা ভাল হবে?"

"কেন বল তো? তোমার নিজের কোন অসুবিধা হবে না তো? টিনের ঘরটায় নিশ্চয় খুব সাজিয়ে-গুছিয়ে বসেছো—"

"না, সেজন্যে বলছি না—এখন বিস্তর নতুন লোক দেখতে পাবেন। সন্ধ্যের সময় সবাই এসে আমার ঘরে জোটে। পাশের ঘরে তো আপনাদের সেই নতুন স্টোরকীপার—তার পাশের ঘরে এসেছেন নতুন জিওলজিস্ট কে. বোস আর কেমিস্ট বি. পি. রায়—এঁরা হচ্ছেন দারুণ গোঁড়া ব্রাহ্ম। ভয় হয় সরকার মশায় কখন কি বলে বসবেন—উনি তো আমাদের কথা শোনেন না। আপনি যাওয়ার পর থেকে ওঁর মুখের লাগাম আল্গা হয়ে গেছে—"

"ওদের কথা থাক। স্টোরকীপার কী দোষ করলো?"

বোস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, "আপনি তো কদিন থাকছেন—নিজেই দেখবেন, চলুন যাই।"

উলিবুরু পাহাড়কে এতখানি বৃক্ষশূন্য কখনও ভাবতে পারিনি। আমাদের সেই কুটিরের আশেপাশে যেসব গাছগুলোকে ভালবেসেছিলাম তার মধ্যে একটি মাত্র খাড়া রয়েছে নিঃসঙ্গভাবে—বাকিগুলিকে নৃশংসভাবে কেটে সেই জায়গায়

দৃষ্টিকটু টিনের বাড়িটাকে খাড়া করা হয়েছে। টিনের উপর রঙের প্রলেপও পড়েনি। ছাদে বা দেওয়ালে কোন কাঠের পাটা লাগানো হয়নি।

এখন অবশ্য শরৎকাল। গরমের সময় বিগত। শীতও তেমন চেপে পড়েনি। সিমেণ্ট-এর মেঝের উপর লোহার কড়ায় আঙ্গার রাখা হয় যাতে শেষরাত্রে ঘর গরম থাকে। কতকগুলি কাঁচা কাঠের তৈরি চেয়ার ও বেঞ্চি দেখলাম টিনের ঘরগুলিতে। শুনলাম দুজন ছুতোর মিস্ত্রী বাহাল হয়েছে ট্রামলাইন ও ট্রেসল্‌স তৈরির কাজে। এরাই নাকি আসবাবপত্রগুলি তৈরি করেছে।

আমার অনুপস্থিতিতে ইউসুফ ও কুমুদ সেনের গল্পের সঙ্গে আমারও কীর্তিকলাপ কিংবদন্তিতে দাঁড়িয়ে গিছলো। শুনে অস্বস্তি বোধ করলেও আশ্চর্য হইনি। উলিবুরুর ঐ ছোট্ট জগতে মাঝে মাঝে শহুরে বাচাল লোকের আবির্ভাব ঘটেছে বটে কিন্তু আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তুর কোন শ্রীবৃদ্ধি হয়নি।

তাঁদের অহংসর্বস্ব ভাব আর জ্ঞান-বিতরণের অহমিকা স্বতঃই সঙ্কুচিত হয়ে যেত সন্ধ্যার সমাগমে।

কি কথায় বক্সী বলেছিল, "ঐ তো এম. এস-সি পাস করা বউবাজারের লায়েক ছেলে চণ্ডী ঘোষ এল, কোথায় জেনে নেবো হাড়কাটা গলির কিছু রসের কথা—ও মা ঘুম থেকে উঠে দেখি ভাগাল্‌-বা।"

চণ্ডী ঘোষকে স্পেন্‌সারের ভাল লেগেছিল তাই সে জঙ্গলের ভয়ে পালিয়ে গিয়েও হেড অফিসের গবেষণা বিভাগে বহাল রইলো।

একবার জানতে চেয়েছিলাম, "জেনেশুনেই তো যাওয়া হয়েছিল—একটা রাত যখন কাটলো তখন কি আর একটা কাটতো না?"

কোন উত্তর পাইনি। তবে আমি জানতাম পালিয়ে আসবার কারণ বাঘ-ভাল্লুক বা রোগের ত্রাস নয়—বক্সী ও সরকারের মত অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধাও নয়—আসল কারণ অন্য।

শহরবাসী মানুষ, যে ঘুড়ি বা পায়রা ওড়াবার প্রয়োজনে ছাড়া আকাশের প্রতি তাকিয়ে দেখেনি তার কাছে সূর্যাস্তের পর তিমির ঘনায়মান বনানীর প্রকৃতি অসহনীয় ভাবে আতঙ্কর প্রতীয়মান হতে পারে। এই সময়টায় মহাবনের সমুদয় উদ্ভিদ, প্রাণী-নিচয়, নদী-নালা, পর্বতমালা যেন বিরাট নভোতলে লীন হয়ে যায়।

চণ্ডী ঘোষ হয়ত বুঝিয়ে বলতে পারে না বলে নীরব ছিল।

বক্সী তার স্বরচিত কিংবদন্তীতে রঙ চড়িয়েছিল আমার মৃত্যু সম্বন্ধে ভুল খবর পেয়ে। বোসকে শপথ করে বলেছিল, গুজবের রচয়িতা সে নয়। আমার প্রেতাত্মাকে গোমেস-এর পরিত্যক্ত কুটীরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখে ঘাসিরাম।

নতুন জিওলজিস্ট কে. বোস-এর বাড়ি গিরিডিতে। এখানে আসবার আগে সিংভূমের জোজোহাটু অঞ্চলে কাজ করেছিল। পাহাড়-পর্বত আর শালবন দেখা অভ্যাস ছিল, কিন্তু সেও সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে থাকতে পারতো না। বোসের ঘরে চলে আসতো। বক্সীর বাচালতাও তাকে ঠেকাতে পারতো না।

সেদিন বোসের ঘরের আড্ডা জমজমাট হয়ে উঠেছিল। অনেকে দূর-দূর ক্যাম্প থেকেও এসেছিলেন আমার সঙ্গে আলাপ করতে। চা ও জলযোগের পর ঘর একটু ফাঁকা হতে দু-জোড়া তাস এসে পড়লো। খেলা জমে এসেছে এমন সময় দূর থেকে শুনলাম, "ঘোষ সাহেব, ঘোষ সাহেব শিগগীর আসুন—"

বোস তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললে, "বলেছিলাম বাঘের বাচ্চা ধরে ভাল করেনি—নিশ্চয় বাঘিনীটা এসেছে—"

যে যা হাতের কাছে পেলো—লাঠি, বন্দুক, বাতি তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো। ডাকটা আসছিল নালার ধার থেকে। ওদিকের জঙ্গল কেটে একটা নতুন খাদান খোঁড়া হচ্ছে। মোড় ঘুরেই গোমেস-এর সেই কুটীর দেখা গেলো। দেখি সুকেশ ব্যানার্জি, হেড অফিসের কেমিস্ট বিজয় গুপ্ত আর বক্সী দরজার কাছে বাতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে ডাকছে সুকেশ।

বোসকে বললাম, "তোমরা সবাই ফিরে যাও। জানোয়ারের ব্যাপার নয়।"

সুকেশ বাতিটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, "নিজের চোখে দেখুন আপনাদের স্টোরকীপারের কাণ্ড—"

ভাবলাম কোন অপহৃত জিনিস দেখাচ্ছে বুঝি। বাতি হাতে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। তারপর কোন কথা না বলে পাহাড়ে উঠে এসে বোসের ঘরে ফিরে চুপ করে বসে দম নিলাম কিছুক্ষণ। তখনও আমার দুর্বল মাথা মাঝে মাঝে ঝিমঝিম করতো।

বোস উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইলো, "এক কাপ গরম চা করে দেবো?"

অবসন্ন ভাবে বললাম, "না।" দেখলাম সকলের চক্ষু আমার প্রতি নিবদ্ধ। আরও দেখলাম সুকেশ, গুপ্ত ও বক্সী ঘরে প্রবেশ করে এমনভাবে বসলো যেন কতই দিগ্বিজয় করে ফিরেছে।

আমি ভাবছিলাম আচমকা গোমেস-এর পরলোকগত স্ত্রীকে এমন সুস্পষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম কেন ?

সুকেশ একটু পেঁচিয়ে কথা বলতো, "ওকে হাতেনাতে ধরিয়ে দেবো বলে এতদিন কিছু বলিনি। নালার ধারে লুকিয়ে থেকে বক্সী আর আমি কম মশার কামড় সহ্য করিনি! অভিসারের জায়গাটা যে রেজাদের যাতায়াতের পথে পড়বে সেটা অবশ্য আন্দাজ করেছিলাম—তাই বলি গাছ কাটায় এত আপত্তি কেন ?"

বক্সী বলল, "আদিবাসীরা ক্ষেপে গেলে কিন্তু রক্ষে থাকবে না!"

বিজয় গুপ্তকে কলকাতায় কুমুদ সেন-এর গবেষণাগারে দেখেছিলাম। সে বলল, "ছি ছি, বাঙালীর বদনাম হয়ে যাবে।"

কে একজন বললে, "লোকটা মদ খেতে পারে বটে—বোতলে সরে না—কলসী কলসী দরকার হয়—বোসবাবু তো বলছিলেন ওঁর ভয়ে—"

জিওলজিস্ট বোস ও কেমিস্ট রায় নতুন এসেছেন কিন্তু স্টোরকীপার-এর পাশের ঘরে থাকতে হয়। মধ্যে পাতলা টিনের দেওয়াল। চুপিচুপি কথা বললেও শোনা যায়। সুকেশ বলল, "এঁরা খাঁড়া, ত্রিশূল, সিঁদুর আর রেডওকারে ছোপানো কাপড়ের বুজরুকি দেখে তো ভড়কে গিছলেন। ম্যানেজারকে বলতে গিয়ে অপমানিত হন—হোয়াটস দ্যাট টু ইয়ু—সো লঙ্ হি ডাস্ নট্ ডিস্টার্ব—হট্টগোল করে কি ? আরে মশাই—চেঁচামেচি নাইবা করলো—ডিসটার্বড্ কে না হয় ? আমরা অত দূরে থেকেই ডিসটার্বড্ হচ্ছি, ওরা তো নাকের ডগায়—বলুন না বোস মশায়—এই রকম লম্পট, মাতাল লোকের সঙ্গে এক ক্যাম্পে থাকা কি সম্ভব ?"

এবার সকলেই কিছু না কিছু বলল অনুপস্থিত স্টোরকীপারের বিরুদ্ধে। আমি লক্ষ্য করলাম দু-পাশের প্রতিবেশী নিজেরা মুখ ফুটে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার কথা বলেনি।

হঠাৎ সমস্ত টিনের বাড়ি কাঁপিয়ে একটা অট্টহাসি উঠলো পাশের ঘর থেকে। তারপর উত্তমাঙ্গ নগ্ন, তাম্রবর্ণ, স্খলিতচরণ, রক্তবস্ত্র পরিহিত লোকটি দরজায় দাঁড়িয়ে অপ্রকৃতিস্থর মত প্রশ্ন করলো আমাকে, "দেখলেন তাকে ? চিনতে পারলেন ?"

আমি উঠে গিয়ে লোকটির পিঠে হাত দিয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম। সে অবসন্নের মত চোখ বুজতে নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে জনতার মাঝখানে এসে বসলাম।

অভিযোগকারীদের মধ্যে কেউ ভাবেনি স্টোরকীপার ফিরে এসেছেন তাঁর ঘরে। কোন শব্দ হয়নি, বাতি জ্বলেনি। হাসির দমকে সকলের মুখ শুকিয়ে গিছলো কারণ সকলেই অভিযোগকারীদের সমর্থন করেছিলেন। একজন মানুষ এত লোককে ত্রাসে অভিভূত করে দিতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।

সবাই সমষ্টিগতভাবে আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে গিছলো।

আমি প্রকাশ্যে সুস্থির ও অচঞ্চল থাকলেও, অন্তরেতে বোধ করি ওদের সকলের চেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম।

দৈবাৎ বজ্রপাতের মতই স্টোরকীপারের ঐ হাসি আর আমাকে ঐ সংক্ষিপ্ত ও তীব্র প্রশ্ন মনের মধ্যে সংশয়ের সৃষ্টি করেছিল।

সেবার গোমেস-এর স্ত্রীকে দেখার কিছু পরেই জ্বরের ঘোরে মাথা বিকল হয়ে যায় সুতরাং আচমকা অনুরূপ আলো-অন্ধকারে পুরাতন স্মৃতি প্রক্ষিপ্ত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু এই লোকটি কেমন করে জানতে পারলো? ও কি মনের ভেতর প্রবেশ করতে পারে?

অন্যরা, এমন কি বোস পর্যন্ত ভাবলে যে লোকটি সুরার প্রভাবে নিজের লাম্পট্যের বড়াই করেছে। অতএব আমি অবিলম্বে তার বরখাস্তের জন্যে সুপারিশ করবো।

পরদিন কাজের ক্ষেত্রে লোকটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে মনে হলো না পূর্বরাত্রের কোন ঘটনাই তার স্মৃতিতে আছে। কাজ দেখলাম আশ্চর্য পরিষ্কার। ম্যানেজার বললেন, "প্যাকাররা উপস্থিত না থাকলে লোকটি নিজের হাতে বড় বড় বাক্স খোলে। রেজাদের ছুটি হয়ে গেলে মালপত্র নিজে বয়ে নিয়ে গিয়ে গুছিয়ে রাখে। খাতাপত্র আপ্-টু-ডেট্ লেখা থাকে।"

কলকাতায় ফিরে গিয়ে কর্তাদের বললাম, "লোকটি সামাজিক দিক থেকে দেখতে গেলে মনে হয় খামখেয়ালী, সৃষ্টিছাড়া—কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে খুবই ভাল।"

বোসের জন্যে একটু চিন্তা হলো। ওকে কোনও রুম-মেট নিতে বলেছিলাম বলে আমার ওপর অভিমান করে সেদিন জলখাবার খায়নি।

য়ুগাণ্ডা থেকে দাদা এলেন ছুটি নিয়ে। তিনি বিবাহ করলেন বিখ্যাত নৃত্যাদির সংগঠক হরেন ঘোষের শ্যালিকাকে। তারপর মদনমোহনতলায় মামার বাড়ির পাশে আগের চেয়ে বড় দেখে একটি বাড়ি ভাড়া করে সংসার পাতলেন।

কয়েক মাস যেতে না যেতে আমি বেরিবেরিতে আক্রান্ত হয়ে সঙ্কটাপন্নভাবে অসুস্থ হই। হৃৎপিণ্ড স্ফীত হয়ে বিকল হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। ইতিমধ্যে দাদা বাড়ি তুলে দিয়ে আফ্রিকায় ফিরে যান। ছোট ভাইকে জলপাইগুড়িতে চলে যেতে হয়।

মেডিকেল কলেজের একটি কেবিনে পড়ে আছি। হৃৎপিণ্ডের মাতামাতি বিশেষ কমেনি তখনও। একদিন অপরাহ্ণে আমাকে দেখতে এলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মনে হলো কোথায় যেন দেখেছি এঁকে।

বললেন, "মনে আছে সেই কালবৈশাখী ঝড়ের রাতে তাঁবুর মধ্যে?—চৌকিদার ছুটে এসে আমাদের খবর দেয় সে ভূত দেখেছে—'বার্ড কোম্পানিকা' ঘোষসাব—মার গিয়া থা—আভি আ রাহা হ্যায়—', কথা কটা বলে লোকটা ঠকঠক করে কাঁপতে লেগেছিল। আমরা দূর থেকে দেখি স্লিপার্স-এর গাদার ওপর—"

"কিন্তু আপনাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না তো—যাঁকে দেখি তিনি ছিলেন বয়সে অনেক ছোট—বলেছিলেন বেঙ্গল টিম্বার—"

"হ্যাঁ, আমার ছেলে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিল—আমিও ছিলাম সেই তাঁবুতে, বেড়াতে গিয়েছিলাম ওর কাছে। আপনাদের স্টোরকীপারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তিনি রেল থেকে যখন মাল নামাতে আসেন—তারপর থেকে ওঁর কাছে অনেকবার গেছি। উনিও প্রতি বুধবার এসে তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান সম্বন্ধে গল্প করে যেতেন। একদিন এসে বললেন যে ক্যাম্পের লোকগুলো বড় পিছনে লেগেছে—সাধনার অসুবিধে হচ্ছে, হয়ত চলেও যেতে পারেন।—এর পর আমার ছেলেকে ক্যাম্প উঠিয়ে পানপোশে চলে যেতে হয়। সে কদিন আমি কলকাতায় আসি বিশেষ কোন কাজে—তাঁকে চিঠি লিখি—উত্তর আসে অনেক দিন পরে কামাখ্যা থেকে—এই সেই চিঠি আপনাকে দেখাতে এনেছি—"

আমি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আসবার আগে ম্যানেজারের চিঠিতে পড়ে-

ছিলাম স্টোরকীপার তার জিনিসপত্র রেখে ছুটি না নিয়েই কোথায় চলে গেছে। প্রথমে মনে হয়েছিল হয়ত বাঘে তুলে নিয়ে গেছে কিন্তু খাতাপত্র দেখে মনে হয় সে সব কিছু গুছিয়ে রেখে ইচ্ছা করেই কোথাও চলে গেছে। তাছাড়া মেসের খরচ বাবদ কিছু টাকা খামের মধ্যে ভরে কাকে যেন দিয়ে যায়। সবই রহস্যপূর্ণ। জিনিসের মধ্যে একটা তালাবন্ধ ট্রাঙ্ক ও একটি বাঁধা বিছানা। ম্যানেজার জানতে চেয়েছিলেন সে দুটি নিয়ে কি করা যায়!

আমি কদিন অপেক্ষা করার জন্যে সুপারিশ করে ফাইল পাঠিয়ে দিয়ে অসুখে পড়ি। দরখাস্তে ছিল শিয়ালদার কাছে একটি হোটেলের ঠিকানা। সেখানে খোঁজ নিয়ে বাড়ির ঠিকানা পাইনি।

আগ্রহভরে চিঠিখানা পড়লাম। হস্তলিপির ইংরাজি অংশগুলি আমার পরিচিত। পত্রলেখক সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইলো না। তিনি কোম্পানিকে উদ্দেশ করে লিখেছেন যে তাঁর ট্রাঙ্ক ও বিছানা যেন পত্রবাহককে দিয়ে দেওয়া হয়। আলাদা করে তাঁর বন্ধুকে লিখেছেন, তন্ত্রশাস্ত্রের পুঁথিগুলি সংগ্রহ করতে তাঁকে আজীবন চেষ্টা করতে হয়েছে, সেগুলি যেন তিনিই রেখে দেন। বাক্সের তালার চাবি ভাঙলেই হবে। মূল্যবান আর বিশেষ কিছু নাই।

চিঠি ফিরিয়ে দিতে বৃদ্ধ বললেন, "আপনাদের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে-ছিলাম। উনি আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনিও কি তন্ত্রসাধনা করেন?"

ভদ্রলোক বললেন, "উনি সাধক ছিলেন, আমি ওঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছি—"

"উনি কি মৃত ব্যক্তির আত্মাকে ডেকে নিয়ে আসতে পারতেন?"

বৃদ্ধ হেসে বললেন, "উনি কেন, আমিও পারি—"

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স এসে বললে, "আপনার বেশি কথা বলা বারণ।"

আমি চিঠির এক কোণে লিখে দিলাম, এই ভদ্রলোককে স্টোরকীপারের জিনিসপত্র দিয়ে দেওয়া হোক।

রাত্রি নটার সময় নার্স বদল হয়। একজন হৃষ্টপুষ্ট প্রফুল্লচিত্ত নতুন নার্স এসে বললে, "তোমাকে তিন নম্বর ঘরটা দিয়েছে। খুব মজা তো। এই খাটটার ওপর তোমারি মত দেখতে একজন লোক সেদিন নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেছিল।"

আমার বুকে দামামা বাজছিল—তালটা দ্রুত হয়ে গেলো।

। ২২ ।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে কালীপদ ঘোষের চিকিৎসাধীনে থাকতে থাকতে ওঁর বাড়িতেই 'পেইং গেস্ট' হয়ে থেকে গেলাম। সে-সংসারে অনেক কিছু আমার কাছে আকর্ষণীয় ছিল। অসাধারণ প্রতিভাশালী পরিবার ও বন্ধুমণ্ডলী, সঙ্গীতজ্ঞ শিশুকন্যা। অবাধ স্বাধীনতা। গল্পের উৎসাহী শ্রোতা। মোটরগাড়ি।

তথাপি কোন-না-কোন ছুতা করে খনি-পরিদর্শনে যাওয়া অব্যাহত রইলো। একবার দীর্ঘদিনের মত গিয়ে দুজন বাঙালী ঠিকাদারের সঙ্গে আলাপ হলো। একজন কে. বাসু ও আর একজন বি. সি. পাল।

দুজনেই খাওয়াতে ভালবাসতেন। আমি কাজ সেরে ফেরবার সময় বরাবর একদিন বিরাট ভোজের আয়োজন করতেন। সেবার ছিল পাল মহাশয়ের পালা। তাঁর খড়ছাওয়া মাটির বাড়ির মধ্যে একটি ঘর ছিল বেশ প্রশস্ত। তার মধ্যে তেরপলের লম্বা লম্বা আসন পেতে আমরা বসে যেতাম পাশাপাশি ক্যাম্পসুদ্ধ লোক। মেট-মুন্সীদের ঊর্ধ্বতন সকল কর্মচারী ও ঠিকাদারই জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বসে যেতেন। একজন নিরামিষাশী কচ্ছি ও একমাত্র ফিরিঙ্গী সাহেব অনুপস্থিত থাকতেন সেই ভোজসভা থেকে।

সন্ধ্যার পর আমরা জনাপঁচিশ লোক জমায়েত হয়েছি পাল মশায়ের ঘরে। পোকার উপদ্রবের জন্য উজ্জ্বল পেট্রোল বাতিগুলিকে বহির্বারান্দায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গৃহকর্তার হাঁপানির বেগ উঠেছিল বলে রন্ধন ব্যাপারের ভার পড়েছিল অন্যের উপর। মশলার গন্ধে আমাদের রসনা সিক্ত হয়ে এসেছে। এদিকে ভূতের গল্প জমে উঠেছে। যথাসময়ে আহারে ডাক পড়লো। খেতে খেতে গুঞ্জনধ্বনি উঠলো 'চিংড়ি' 'চিংড়ি'! পাল মশায়ের মেনুতে কোন-না-কোন বিস্ময় মজুদ থাকতো। এবারে চিংড়ি। অবশ্য মাংস, ঘিভাত ও চাইবাসা থেকে আনানো ফলমিষ্টান্ন ছিল কিন্তু বহুদিন মৎস্যাহার থেকে বঞ্চিত বাঙালী ও উড়িয়া ছেলেদের ভাগ্যে চিংড়ি জুটে যাবে সে সৌভাগ্য ছিল অপ্রত্যাশিত।

পাল মশায় উপস্থিত ছিলেন না। আমরা পরম তৃপ্তিভরে আহার-পর্ব শেষ করে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গেলাম।

"সে কি? চিংড়ি তো আনাইনি!"

ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে পাকঘরে গিয়ে কালিয়ার হাঁড়ির ডালাটা খুলে

দেখেন থিক থিক করে ভাসছে পাতলা পালক আর আলুর সঙ্গে মিশে অজস্র পা-বালিশ আকারের পোকা।

ততক্ষণে উদ্গিরণ করে কোন লাভ হতো না। সৌভাগ্যবশতঃ হজমের কোন ব্যত্যয় হয়নি।

এই দুই ব্যক্তির আগমনে বক্সী ও সরকার মশায়ের মত আরও কোন কোন রসালাপ ও চ-প্রয়াসী মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। ইউসুফ ও আমার আমলের কৃচ্ছ্রসাধনার যুগ প্রাণান্ত চেষ্টা করেও বোস ও চরিত্রবান ব্রাহ্ম ক্যাম্পবাসীদ্বয় অব্যাহত রাখতে পারেনি। একবার শুনলাম বক্সী বোসকে প্রশ্ন করছে, যখন ঠিকাদারদের মধ্যে কেউ কেউ উপপত্নী আমদানি করে দিব্যি সংসার-সুখ উপভোগ করছে তখন কোম্পানির বিশ্বাসী ও পরিশ্রমী কর্মীদের সম্বন্ধে কড়াকড়ি শাসন কেন?

বক্সী বোসকে খেপাবার জন্যে অনেক কথাই বলতো। সে কার কথা উল্লেখ করছে তাও জানতাম। তবু বোস কি উত্তর দিয়েছিল জানবার জন্যে আগ্রহ হলো?

"তুমি কি বললে?"

"নালার ওপারে গিয়ে যা ইচ্ছে করতে পারে। উলিবুরু ক্যাম্পের মধ্যে ভদ্রতা বজায় রাখতে হবে।"

"যদি সত্যিকার বিয়ে করে বউ নিয়ে আসে তাহলে কি কোন আপত্তি করবে?"

"নিশ্চয় নয়, তবে উঁচু করে বেড়া বানিয়ে নিতে হবে।"

"আর যদি সেই বেড়ার মধ্যে বউকে ধরে ঠেঙায়?"

"তা হলে উঠে যেতে হবে—"

"যদি ঝগড়াঝাঁটির শব্দ শুনতে পাও?"

প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্যে বোস বললে, "সেদিন ম্যানেজার মায়ার্স আর চীফ কেমিস্ট লুকাসের মধ্যে আমার সামনেই গালাগালি থেকে আরম্ভ করে হাতাহাতি হয়ে গেল। আমরা অতিকষ্টে ছাড়ালাম—নাহলে হয়ত খুনোখুনি হয়ে যেত। খবর পেয়ে ডাফ্ সাহেব এসে ম্যাক্কারোর পেটোয়া লুকাসকেই ধমক দিলেন। প্রথমে বাবুদের সামনে 'বিহেভ্' করার কথা মনে করিয়ে দেন, তারপর বলেন বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিককেও ম্যানেজারের আদেশ মানতে হয়।"

ঘটনাটা আমি জানতাম। জেনারেল ম্যানেজারের গোপনীয় রিপোর্টটা হকেন

সাহেব-এর টেবিলের উপর পড়েছিল। তারপর লুকাস সাহেবের জবাবদিহিও পড়বার সুযোগ হয়েছিল।

ইয়ুরোপীয় সমাজে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহবাস একমাত্র যুদ্ধের পরিবেশেই সম্ভব হতো। উলিবুরু পাহাড়ে এই নির্জন ক্যাম্পজীবনে নিছক সুরার সাহায্যে অথবা চামড়ার রঙের সমতায় হৃদয়গত সহানুভূতির সৃষ্টি হয় না।

এব্রাহাম এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরাদ্বয়ের সান্নিধ্য সহ্য করতে পারেনি। পরবর্তী ম্যানেজার মায়ার্স-এর প্রচেষ্টায় লরী ও ল্যাঙ্কাস্টারদের জন্য পৃথক পৃথক টিনের ঘর বানিয়ে দিয়ে তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হয় ও পরে দুই ইংরাজের মধ্যে তো এই কাণ্ড।

এই ব্যাপারটা নিয়ে দুই মহারথী ডাফ্ ও ম্যাক্‌কেরোর মধ্যে বিবাদ শেষ পর্যন্ত মিটিয়ে দেয় ব্ল্যাকওয়াটার জ্বর।

লুকাসের রক্তপ্রস্রাব শুরু হতে তাকে চাইবাসা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। কলকাতা থেকে দুজন দক্ষ নার্স আসে। মায়ার্স দেখতে গেলেন। চিকিৎসক বললেন, জীবনাবসান হয়ে এসেছে। রোগী সংজ্ঞাশূন্য, কোমায় আচ্ছন্ন। মায়ার্সকে উলিবুরুতে ফিরতেই হবে। তিনি সময় সংক্ষেপের তাগিদে মিস্ত্রী ডাকিয়ে লুকাস-এর মাপে একটি কফিন বানিয়ে প্রস্তুত রাখলেন।

পরের দিন ফিরে এসে দেখেন তখনও জীবনমরণের যুদ্ধ চলেছে। তিনি নিজে জ্বরগায়ে এসেছিলেন। প্রস্রাব হলো রক্ত। পাশের কামরায় শুয়ে পড়তে হলো। তিনদিনের মধ্যে লুকাস এর জন্য তৈরি কফিনের মধ্যে পুরে তাঁকে গোর দেওয়ার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এলেন ডাফ্ ও তাঁর সহকারী আলেকজাণ্ডার সাহেব।

লুকাস সেরে উঠে লম্বা ছুটিতে সিংহলে পাড়ি দিলেন।

॥ ২৩ ॥

রেল স্টেশনের নাম হলো 'বড় জামদা'। সেখান থেকে বড়বিল পর্যন্ত একটি ছোট শাখালাইন গেলো উলিবুরুর কোল ঘেঁষে। উদ্দেশ্য ভাগিয়াবুরু আকর থেকে হিরাপুর ও কুলটিতে লোহার রপ্তানি। লৌহশোধনের উপযোগী চুনা পাথরের উপর প্রায় একচেটিয়া অধিকার ইজারা করে নেওয়ার ফলে অল্পপ্রয়াসে লোহা বিক্রি করা সম্ভব, হয়। সাড়ে চার মাইল সাইডিং তৈরি হয় রেল কোম্পানির নিজের খরচায়। এই একই সময় টাটা কোম্পানির নোয়ামুণ্ডি লোহার খাদান খোলা হয়।

উলিবুরু ক্যাম্পে স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতে বড়বিল ও গুয়াতে কতকগুলি পাথরের ভিতের উপর মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাদ সমন্বয়ে বাড়ি তৈরি করে একটিতে পাঠানো হলো ফিরিঙ্গী সাহেব লরীকে।

একদিন চা-এর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে দেখি লরী সাহেব বেশ যোগাড়ে লোক, মিস্ত্রীকে দিয়ে কয়েকটি চেয়ার টেবিল মায় একটি কাপড়চোপড় রাখবার আলমারি পর্যন্ত বানিয়ে নিয়েছে। বাড়ির চারদিকে বেড়া খাড়া করে কয়েকটা ফুলগাছও লাগিয়েছে। ঘর দুটি বেশ প্রশস্ত। ভিতর দিকে উঁচু টিনের বেড়া ঘেরা উঠানে রাখা হয়েছে ছাগল ও মুরগী। খুশি হলাম। জঙ্গলে বাস করতে হলে নিজের চেষ্টায় আরামের ব্যবস্থা করে নিতে হয়।

হাণ্টলী পামার্স-এর বিস্কিট চিবুতে চিবুতে গল্প করছি। লরী তার বয়স্কাউট আমলের ছুরি দিয়ে দুধের টিন খুলতে ব্যস্ত, এমন সময় আমাদের মাথা বরাবর টিনের চালার উপর ভীষণ ভারি একটা কি পড়লো। ভয়ঙ্কর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ছাদের এক অংশ খুলে নেমে আসবার উপক্রম হলো। দেখি চোখের পলকে আমার নিমন্ত্রণকর্তা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। মাথার উপর তুমুল শব্দ ও টিনের নাচন চলেছে। আমি তো হতভম্ব। টেবিলের তলা থেকে প্যাণ্টে টান পড়তে দেখি লরীর হাত। ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, "দেখছো কি, ডাক্, জয়েন্ মি, ইট্স দি ব্লাডি প্যান্থার—আণ্ডারশট ফর মাই গোট—"

অর্থাৎ প্যান্থার লাফ দিয়েছিল ছাগলের লোভে কিন্তু ছাদ টপকাতে পারেনি। যতবার উঠানের দিকে যাবার চেষ্টা করছে ততবার শরীরের ভারে পিছলে নেমে আসছে। যে কোন মুহূর্তে ঘরের মধ্যে টিনের ফাঁক দিয়ে পড়ে যেতে পারে।

আমি দ্বিরুক্তি না করে নরীর পাশে আশ্রয় নিয়ে বললাম, "ঐ তো ঘরের কোণে বন্দুক—তলা থেকে গুলি করে দিলে কেমন হয়!"

"ওতে টোটা পোরা নেই। দরজা খোলা। যে কোন মুহূর্তে ওপর থেকে কিংবা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে আক্রমণ করতে পারে।"

বললাম, "ঠিক বলেছ, জখম করলেই মরীয়া হয়ে আক্রমণ করতে পারে—"

ছাগ বৎস দুটো ততক্ষণে তারস্বরে চিৎকার করে লোলুপ ব্যাঘ্রের কর্ণে সুধা-বর্ষণ করে চলেছিল এবং আড়াল থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম, গড়ানে টিনের ওপর ওঠার বারংবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে পশুটি ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠছে।

ঘড়ি ধরে বলতে গেলে বোধ করি এই সংশয়পূর্ণ প্রহসন পাঁচ মিনিটের বেশি অনুষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল অনন্তকাল।

আর একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কর্মীকে ডাফ্ সাহেব স্বয়ং নিয়োগ করে হেড অফিসকে জানালেন। লোকটির নাম এ. সি. ক্রিগ্রেড্—ষোল বছর বেঙ্গল আইরনের গ্রেগরীর অধীনে খাদান তদারকের কাজ করেছে।

ম্যাক্‌কেরো লিখলেন, "খরচের দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। ব্যাঙ্কের কাছ থেকে দু লক্ষ টাকা কর্জ হয়ে গেছে। অগত্যা পরলোকগত মায়ার্স-এর পদে নরীই বহাল থাক, স্পেন্সর মাঝে মাঝে যাবে এখন। [তিরিশে অক্টোবর ১৯২৫ সালের চিঠি। জানালেন—] ৪৮% গ্রেডের মূল্য (জাহাজ পর্যন্ত) ৩৭৲ ৩৮।৪২% গ্রেডের মূল্য ২৫৲; গড়পড়তা খরচ হচ্ছে ২৮৲ টন পিছু, উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ ৪৮% না হলে চলে না কিন্তু—"

চিঠি পেয়ে ডাফ্ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে লিখলেন, "এই বিশাল সম্পত্তির ওপর মুরগীর মত তা দিতে বসলে চলবে না। হয় সাহস করে ঠিকমত কাজ কর না হলে সব বন্ধ করে দাও। নরীর মত স্কুলের ছেলের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপালে চলবে না, পেনি ওয়াইস্ পলিসির মধ্যে আমি নেই।"

এই সব উপর মহলের বচসার কথা আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়তো হুকেন-এর গাফিলতিতে। ম্যাক্‌কেরো ছিলেন খোদ কর্তাদের মুখপাত্র। সংস্থার পদ্ধতি অনুযায়ী তাঁর পদমর্যাদা ছিল জেনারেল ম্যানেজারের ঊর্ধ্বে কিন্তু ডাফের জেদই শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হতো যেহেতু তিনি ছিলেন কোম্পানির অংশীদার।

পরের বার উলিবুরুতে গিয়ে দেখলাম ক্রিগেড্ লোকটি ইতিপূর্বেই বেশ জন-

প্রিয় হয়ে গেছে। মধ্যবয়সী বিবাহিত মানুষ, বেশ গুছিয়ে সংসার করছে। স্ত্রী তখনও আসেনি কিন্তু ভৃত্য সঙ্গে এসেছে ঘরসংসারের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে। নিপুণ হাতে মাটি লেপে পুরু দেওয়াল ঘেরা দুটি ঘর। কব্জা আঁটা জানালা-দরজা। টিনের ছাদের ওপর খড়ের আচ্ছাদন। পালিশ করা আসবাবপত্র।

একখানি ডেকচেয়ারে বসিয়ে বললেন, "আপনাদের এখানে কিছু পাওয়া যাবে না বলে আমার সহধর্মিণী জোর করে পাঠিয়ে দিলেন কিছু কিছু দরকারী জিনিস-পত্র। আশা করি আমার সহকর্মীরা আমাদের শৌখিন লোক মনে করবেন না। এইসব আসবাবপত্র দরজা-জানালা নিজের হাতে বানিয়েছি। কিছুই কিনতে হয়নি। কোম্পানির ছুতোর মিস্ত্রীদেরও কাজে লাগাইনি। ঘর সাজিয়েছি স্ত্রীর নির্দেশমত। তবে ঐ ছবিটা নিজে টাঙিয়েছি। কেন দেখবেন?"

সবিস্ময়ে দেখলাম ছবি দিয়ে তিনটে গোল ছিদ্র ঢাকা হয়েছে।

বললেন, "এই দুটো দেখবার আর এইটা দিয়ে গুলি করবার। সেদিন ঘরে দাঁড়িয়েই একটা প্যান্থার মারি—চামড়াটা দেখবেন?"

দেখলাম লোকটি চামড়াটিকে যথারীতিতে জরিয়ে রেখেছে।

চা খেয়ে অনেকক্ষণ গল্প শুনলাম। ঈর্ষা হচ্ছিল লোকটির সৌভাগ্যে। তিনি তাঁর স্ত্রীর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। গৃহিণী নাকি সর্বগুণসম্পন্না—চিকিৎসক, শুশ্রূষা-কারিণী, পাচিকা, সূচীকার্যে অভিজ্ঞা, শিক্ষিতা, সুন্দরী।

গুণকীর্তন করলেন কথায় কথায়। নানা ধরনের প্রসঙ্গক্রমে। বুঝলাম তাঁদের দাম্পত্যজীবন খুব সুখের।

বিদায় নেওয়ার আগে বাঘের গল্প হচ্ছিল। তিনি বললেন, "আমি মধ্যে কিছুদিন কোন কাঠের ব্যবসায়ীর কুপে কাজ করেছিলাম। একদিন বোনাই রাজ্যের দেওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঘোড়ায় চড়ে ফিরছি। হঠাৎ গাছের আড়ালে দেখি একটা মস্ত রয়াল বেঙ্গল টাইগার কি একটা ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে চলেছে। সঙ্গে বন্দুক ছিল না সেদিন। পাছে ঘোড়া ভয় পায় আস্তে আস্তে গাছের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম। মোড় ঘুরে আবার দেখি সেই বাঘ, তারপর ঘোড়ার রাস টেনে দাঁড়িয়ে যেতে হলো। দেখি একটা ন-দশ বছরের ছেলে টাঙ্গি হাতে ছুটে আসছে। সেই সঙ্গে চোখে পড়ে বাঘের মুখে একটা মানুষ। চোখের নিমেষে ছেলেটা বাঘের পথ আগলে কুড়ুলের কোপ মারলো। ভাবলাম এবার বাঘটা মানুষটাকে ফেলে ছেলেটাকে ধরবে। দেখি

সেই পশুটা বিকট একটা চিৎকার করে কাত হয়ে পড়লো। তার মাথার মধ্যে আটক রয়েছে টাঙ্গির ফলক। ছোট্ট ছেলেটা সেদিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত না করে মৃত মানুষটাকে পশুর মুখ থেকে ছাড়িয়ে নিতে ব্যস্ত। আমি ঘোড়াটাকে গাছে বেঁধে ওদিকে গিয়ে দেখি আরো জনাকয়েক লোক জড় হয়ে গেছে। তারা নিশ্চয় আড়ালে ছিল। আমার মত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিছলো।

"পিতার মৃতদেহ থেকে রোরুদ্যমান বালককে টেনে তুলে নিলাম। বাঘটাকে উল্টে দেখলাম টাঙ্গির ফলাটা দুই চক্ষুর মাঝ দিয়ে গভীরভাবে ঢুকে রয়েছে। আমরা বালককে ও বাঘের লাশটা তুলে নিয়ে রাজার দরবারে গেলাম। গ্রামের লোকেরা এসে লোকটির মৃতদেহ নিয়ে গেল।

"রাজাসাহেব বালককে একশ টাকা পুরস্কার দিয়ে বাঘের লাশ ও টাঙ্গিখানা রেখে দেন। খবর নিয়ে জানলাম ছেলেটির বয়স বারোর কম। দরবারে গেলে দেখবেন বাঘের মাথার সেই ফাটানো খুলি বাঁধিয়ে রাখা আছে। বলতে পারেন, এটুক ছেলে এত সাহস এত জোর পেল কোথা থেকে?"

কোন উত্তর না দিয়ে আমি চিন্তাবিষ্টের মত চলে যাই বোসের কাছে।

মায়ার্স-এর পদে এলেন অলিভার। তারপর এলেন ডাক্সবেরী, জুয়েল, বেনেট, বুনিন ও ইয়েগার। প্রথম তিনজন ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়াতে ভুগে ভুগে চলে যায়। এদের মধ্যে একজন ফেরার পথে ব্ল্যাকওয়াটারে আক্রান্ত হয়ে সমুদ্রবক্ষেই মারা পড়ে। মধ্যে ক্যাপলিন নামক এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিলাত থেকে বহু টাকা বেতন ও প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দিয়ে আনানো হয় ও তাঁর জন্যে একটি সুরম্য কুটির তৈরি করিয়ে স্বয়ং ডাফ্ সাহেব সহকারীসহ দরজা, জানালা ও থামগুলিতে রাত জেগে রঙ করেন। ততদিনে চাইবাসা হয়ে চক্রধরপুরে যাওয়ার উপযোগী মোটর-রাস্তাও চালু হয়ে গেছে। ডাফ্ সাহেব তাঁর নিজের ভাল গাড়িটি পাঠালেন হাওড়া-নাগপুর মেন লাইনে, পাছে লোকটির রেলের গাড়ি বদল করতে কোন কষ্ট হয়। নতুন ম্যানেজারকে অভিনন্দন জানাতে কর্মীবৃন্দ জমায়েত হলো। তিনি ডাফ্ সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে বাড়ি দেখতে চললেন।

সেদিনের ঘটনা বোসের কাছে শোনা। আমি দীর্ঘাকৃতি সদ্য বিলাত থেকে আসা গলদা চিংড়ি রঙের চেহারাটি কলকাতার দপ্তরে দেখেছিলাম একবার।

লোকটি নবরচিত আবাসটির সামনে থমকে দাঁড়িয়ে একবার মাথা নেড়ে বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়িতে উঠে হুকুম করলেন, "যেখান থেকে এসেছি সেখানে নিয়ে চল।"

অন্য সাহেবরা তো হতভম্ব। ড্রাইভার চক্রধরপুরের দীর্ঘপথে যাওয়া-আসা

করে সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে বললে, "সাহেব রেলওয়ে থানা কামরায় বিয়ারের বোতল খুলে বসে আমাকে বিদায় হতে বললেন।"

কোম্পানিকে ফিরে যাওয়ার জাহাজ ও গাড়ি ভাড়া ছাড়া আর কি গুনাগার দিতে হয়েছিল স্মরণে নেই।

যত কৃপণতা ভারতীয়দের বেলায়।

ছোট ছোট টিনের ঘরের মধ্যে শীতে জমে যেতে হয়। প্রতি রাত্রে তাঁবুর ওপর জমাট তুষারের পর্দা পড়ে যায়। সকালে উঠে পদাঘাত করলে পুরু কাচের মত বরফের আবরণ খসে পড়ে। টিনের ঘরে বিশেষ করে ছাদের নিচে কাঠের আচ্ছাদন থাকলে হয়ত এতখানি কষ্ট হতো না, কিন্তু সবই খরচসাপেক্ষ। "পাগল নাকি, কোম্পানি ফেল মেরে যাবে না!" কর্তাদের বাঁধা উত্তর ছিল।

আমি তখন মাঝে মাঝে খাদানে খাদানে গিয়ে মজুদ ম্যাঙ্গানিজ ও যন্ত্রপাতির গোনাগুন্তি করছি; কলকাতা দপ্তরে বসে বিলাতের সঙ্গে মাল বিক্রয় নিয়ে চিঠি-পত্র লিখছি; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বাজার দর মিলিয়ে বিবিধ গ্রেড ম্যাঙ্গানিজের মূল্য ধার্য করছি। হুকেন সুপারিশ করলেন বেতন বাড়িয়ে দিতে। স্যার জর্জ গড্‌ফ্রে মঞ্জুর করলেন ২০০।২২৫।২৫০৲। ফাইলটি আমার পূর্ববর্তী শুভাকাঙ্ক্ষী চীফ একাউন্টেণ্ট-এর কাছে যেতে তিনি নোট দিলেন যে তাঁর পূর্বতন কোন কর্মচারীকে এইভাবে মাথায় তুললে ডিপার্টমেণ্টে হুলস্থূল লেগে যাবে। কাজ চালাতে তিনি অক্ষম হবেন ইত্যাদি। অগত্যা কর্তারা নূতন বেতনের হার কমিয়ে ১৪০।১৫০।১৬০৲ করে দিলেন।

এই নোটের আদান-প্রদান আমার জানবার কথা নয়, কিন্তু হুকেন সাহেব বোধ করি ইচ্ছা করেই ফাইলটি নিজের টেবিলে রেখে মধ্যাহ্নভোজনে চলে যান। আমার প্রতি চীফ অ্যাকাউন্টেণ্ট্-এর বৈরিতার কারণ তিনি জানতেন। কলহ বেধেছিল একটি রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে। এই ভারতবিদ্বেষী লোকটি বলেছিলেন যে, ভারতীয়দের পরিচালিত গবেষণাগারের কোন রিপোর্টে তাঁর আস্থা নেই। আমি চিকিৎসকের পরিবারে থেকে ততদিনে শহরের কয়েকটি বড় বড় পরীক্ষামন্দিরের অধ্যক্ষদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। উত্তরটা কড়া হয়েছিল। তারপর বদলির চেষ্টা করি।

যাই হোক, তখন বিবাহ করে সংসার ফেঁদে বসেছি। টাকার প্রয়োজন বেড়েছে। দিনকতক নৈরাশ্যবোধে কষ্ট পেলাম। ক্রমশঃ হুকেনের কল্যাণকর প্রভাবে অন্তর দ্বিধামুক্ত হলো।

লরী বরখাস্ত হয়ে যায় ফ্রিগ্রেড আসার অল্পদিনের মধ্যে। ল্যাঙ্কাস্টার যায় আরও আগে। তারপর আর একজন ফিরিঙ্গী আসে—নাম ক্যাম্পবেল।

এই লোকটি আসে বিহার থেকে। তখন তার বয়স পঁয়তাল্লিশ হবে। অবিবাহিত। অল্পশিক্ষিত কিন্তু গল্পের রাজা। কথার চটকে ভেলকি লাগিয়ে দেয়। হিন্দী, উর্দু, বাংলা যে-কোন ভাষায় অশ্লীল থেকে পরিমার্জিত সকল পর্যায়ে কথোপকথন চালিয়ে যেতে পারে অক্লেশে। বক্সীর চেয়ে পদমর্যাদায় অনেক বড় হলেও রসের সম্বন্ধ পাতিয়ে ফেলেছে।

তখন লৌহপাথরের উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। ভাগিয়াবুরু খাদানের ভারপ্রাপ্ত হয়ে কাছাকাছি একটি মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাদ বাংলোবাড়ি বানিয়ে নিয়েছে। চওড়া বারান্দার দেওয়াল-জোড়া নানা আকারের তীরধনুক, বর্শা, টাঙ্গি, ছোরা, ভোজালি, পশুর শিং ও মাথা।

তিনপুরুষ ধরে বেহারের কোন নীলকুঠিতে প্রতিপালিত হয়ে ক্যাম্পবেল পরিবার একরকম দেহাতী বনে গিছলো, বিশেষ করে বৃহৎ পরিবারের এই অবহেলিত ছেলেটি নিজেকে অজ গেঁয়ো বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা করতো না। বক্সীর সঙ্গে ছিল তুইতোকারির সম্বন্ধ। আমি গেলে দেশী মদের বোতল লুকিয়ে ফেলে মুসলমান ভৃত্যকে চা কিংবা কফি বানাবার হুকুম করতো চোস্ত উর্দু ভাষায়। গল্প করতো শিকারের। কুমীর হত্যার মত অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারকেও বর্ণনার গুণে অতীব হৃদয়গ্রাহীরূপে প্রকাশ করতো।

আমি এতক্ষণ দৃষ্টি প্রসার করে তিন বছরের পরিপ্রেক্ষিতে দেখছিলাম আমাদের সেই সাবেক উলিবুরুর কত বিপুল পরিবর্তন হতে চলেছে।

এর পর একজন রীতিমত পাস-করা চিকিৎসক নিয়োগ করলে বার্ড্ কোম্পানি। প্রায় একই সময়ে টাটা কোম্পানি নোয়ামুণ্ডি খনিতে পাঠালে আর একজন ডাক্তারকে। এতদিন পরে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ভরসা করে পরিবার নিয়ে আসা আরম্ভ করলেন, কিন্তু দুজন চিকিৎসকই অল্পদিনের মধ্যে ব্ল্যাকওয়াটার জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মারা পড়লেন।

ম্যালেরিয়া দূরীকরণের চেষ্টায় রেল কোম্পানি সিনিয়ার হোয়াইট নামে এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করলে এবং তিনি বার্ড্ কোম্পানিকে নির্দেশ দিতে এলেন। সেই সুবাদে আসেন ম্যালেরিয়া ইন্‌স্পেক্টর মাথুর।

এদিকে কেমিস্ট ও জিওলজিস্টদের বদবদল লেগেই ছিল। শেষ পর্যন্ত টিকে গেলেন তিনজন রাসায়নিক সন্তোষ মিত্র, সুখময় চ্যাটার্জি ও যোগেশ চৌধুরী। আমি প্রথম পাঁচ-ছয় বছরের কথা বলছি। তারপর ক্যাম্পের প্রকৃতি বদলে যায়।

সময়ের পরম্পরা অগ্রাহ্য করে কয়েকটি গল্প দিয়ে বনপর্বটি শেষ করবো। বি. সি. পালের ভোজপর্বের গল্পে ইতিপূর্বেই ১৯২৯ সালের ঘটনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

এম. এ. টালাক নামে একজন ভারতবর্ষে স্থায়ী নিবাসী স্কটিশ কাঠের ব্যবসায়ী এসে বড়বিল গ্রামের কিছুদূরে বাসা করে থাকেন। এই লোকটির পূর্বপুরুষ নাকি ভারতে আসেন লর্ড ডালহৌসীর সময়। একপুরুষ সামরিক বিভাগে প্রবেশ করে আফগানিস্থান অভিযান ইত্যাদি কয়েকটি সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টায় সহায়তা করে। তারপর শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারতে আলমোরা অঞ্চলে এক বিরাট জমিদারি ক্রয় করে বসবাস করতে থাকে।

যে কোন কারণেই হোক বর্তমান পুরুষের জমিদারিতে মন টিকলো না অথবা কাঁচা টাকার চাহিদায় দুই ভাই সুদূর উড়িষ্যা অঞ্চলে পাড়ি দিলেন বামারলরী কোম্পানির কাঠ সরবরাহের কাজ নিয়ে। তখন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের স্লিপার্স-এর চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে।

ইনি থাকতে এলেন সপরিবারে। ততদিনে ফ্রিগ্রেড-এর সহধর্মিণীও সংসার পেতে বসে গেছেন। উত্তর প্রদেশের মাথুর সাহেবও প্রায় একই সময়ে পরিবার-বর্গকে আনিয়ে গুছিয়ে বসলেন।

মাথুর-পত্নী ছিলেন জয়পুর রাজ্যের বিচারপতির কন্যা। উচ্চশিক্ষিতা এবং সুনিপুণ গৃহিণী। পুত্রকন্যারা প্রতিপালিত হয়েছিল পরিমার্জিত উচ্চশিক্ষার আদর্শে।

ফ্রিগ্রেড্ কিছুকালের মধ্যেই আমাদের কোম্পানির কাজে ইস্তফা দিয়ে নিজে খনির ইজারা নিয়ে টালাক পরিবারের কাছাকাছি বাসা তৈরি করে উঠে যায়।

আমি কলকাতায় থাকাকালীন ১৪ই এপ্রিল ১৯২৮ সালে বিবাহ করি এবং সস্ত্রীক উলিবুরুতে আসি বছরেরই শেষের দিকে। আজীবন উত্তর কলকাতার ঘনবিন্যস্ত অঞ্চলে মানুষ নববধূ পাছে জঙ্গলের মধ্যে থাকতে ভয় পায় তাই আমি আমার জন্য সংরক্ষিত কুটিরটির চারপাশে সুউচ্চ বেড়া করে দেবার জন্য অনুরোধ করি। ততদিনে বড় জামদায় প্যাসেঞ্জার গাড়ি যাতায়াত শুরু হয়ে গেছে। স্টেশন থেকে কোম্পানির একটি নিজস্ব সরু গেজের ট্রামলাইনে একটা ঠেলা ট্রলি চলাচল

করতো। গৃহিণীকে তাইতে চাপিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বেড়াঘেরা কুটিরে তুলে নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। ক্যাম্পের সকলেই দেখা করতে এলেন।

সন্তোষ মিত্রর ফরমাশ মত মিষ্টান্ন সঙ্গে এসেছিল। সকলে বিদায় নিতে নিতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ভাবলাম জঙ্গলের সঙ্গে প্রথম পরিচয় খুব সহজেই হয়ে গেল। রাত্রে প্রবল ঝড় হলো। পরদিন প্রত্যুষে উঠে দেখি চতুষ্পার্শ্বের বেড়া পড়ে গিয়ে জঙ্গল ও বাড়ি এক হয়ে গেছে, উপরন্তু ঘরময় ভাল্লুকের পায়ের দাগ।

গৃহিণী ঘুম থেকে উঠে ভাল্লুকের পায়ের দাগ দেখতে পেলেন না বটে কিন্তু একেবারে নাকের ডগায় গভীর জঙ্গল দেখে ঘোষণা করলেন, "আজই ফিরে যাব।"

এক মাসের জন্যে ক্যাশিয়ার ও অ্যাকাউন্টেন্ট-এর বদলি হয়ে এসে ওরই বাড়িতে উঠেছিলাম। উলিবুরু ক্যাম্পে তখনও কেউ পরিবার নিয়ে আসেনি, সুতরাং আমাদের ডেরাটি সকলের আড্ডা হয়ে উঠলো।

তারপর সুকেশ ব্যানার্জি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসেন।

একদিন কয়েকজন ক্যাম্পবাসীকে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করে আমার স্ত্রী জানালেন দু'চারটি বন্য কুক্কুট মেরে আনতে হবে। নবনিযুক্ত চিকিৎসক সূর্যকান্ত রায় উপস্থিত ছিলেন। লাফিয়ে উঠে বললেন তিনি সঙ্গে যাবেন। কথা হলো উলিবুরুর কাছাকাছি জঙ্গলে না খুঁজে আমরা ঠাকুরানী পাহাড়ে উঠবো। উলি-বুরুতে ময়ূর আছে বটে কিন্তু ততদিনে মুরগী দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে।

স্টোরকীপার মধুসূদন মাহাতোকে সঙ্গে নেওয়া হলো কারণ তারও একটি বন্দুক ছিল আর সে স্থানীয় লোক বলে জঙ্গলের পথগুলির সঙ্গে পরিচিত। তখন মাত্র আটটা বেজেছে। গৃহিণী সময় দিয়েছেন এগারোটা পর্যন্ত। ঠাকুরানী তো কাছেই।

সেদিন মাহাতোকে অন্ধের মত অনুসরণ করে পথ হারিয়ে ফেললাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অরণ্য গভীর—দিক্‌নির্ণয় করা কঠিন হলো। শেষ পর্যন্ত একটি ঘুঘুও চোখে পড়লো না। বেলা দুটো নাগাদ দূরে প্রায় দেড় হাজার ফুট নিচে একটি ছোট্ট রেলস্টেশন দেখতে পেলাম। লোহা-পাথরের মত মসৃণ ও কঠিন পথ দিয়ে ওঠার চেয়ে নামা কঠিন। বন্দুকগুলিও ভারবহ হয়ে উঠেছিল। আমরা তবু পড়ি কি মরি করে নামতে নামতে দেখি টাটা কোম্পানির নোয়ামুণ্ডি স্টেশনে চলেছি। সৌভাগ্যবশতঃ একটি মালবাহী ট্রেন গুয়ার দিকে চলেছিল, আমাদের তুলে নিল।

চিকিৎসক সঙ্গেই ছিল। তাঁকে বললাম, ঘরে ফেরার সাহস নেই—হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে শরীরের উত্তমাঙ্গটা স্প্লিন্ট ও ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে নিয়ে যেতে।

মাহাতো হেসে ফেলতে পারে বলে ওকে বিদায় দিয়ে চিকিৎসক আমাকে ধীরে ধীরে ধরে নিয়ে গিয়ে উদ্বিগ্না গৃহিণীকে খবর দিলেন যে অতিকষ্টে ভাল্লুকের কবল হতে আমাকে রক্ষা করেছেন। উঁচু পাহাড় থেকে নামাতে সারাবেলা কেটে গেছে। ক্ষুধায় পাকস্থলী পাক দিতে আরম্ভ করেছে ইত্যাদি। কোন ভয়ের কারণ নেই শুনে তিনি নিশ্চিন্ত। ক্রোধ আতঙ্কে পরিণত হয় আরও অনেক আগে। নিমন্ত্রিত সহকর্মীদের যথাসময় কুক্কুটবিহীন আহার করিয়ে বিদায় দিয়ে উৎকণ্ঠিত ভাবে পাহাড়ের দিকে তাকিয়েছিলেন।

দুজনকার খাবার বেড়ে আনতে চিকিৎসক বললেন, "আমাকে দুটো থালাই দিন মিসেস ঘোষ। ওঁর জ্বর আসতে পারে—শুধু টিনের দুধ—"

আমি আর থাকতে না পেরে লাফ দিয়ে উঠে স্প্লিন্ট বাঁধা হাত দিয়ে মারতে গেলাম তাঁকে।

বিস্ময়ে হতবাক্ স্ত্রীকে আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা বলা হলো। তাঁর উদ্বেগ উপশম হতে এত খুশী হলেন যে রাগ করার কথা মনেই রইল না।

পরের দিন সন্ধ্যার পর চিকিৎসক এসে উপস্থিত। একজন রেজা ম্যাঙ্গানিজ ভরতি চলমান টবে চাপা পড়েছে। পা-টা কেটে ফেলার দরকার। সাহায্য করতে যেতে হবে। কেমিস্টরা সকলে বড়বিলে ফিরে গেছে। আমি ছাড়া আর কেউ নেই।

কলকাতার মেয়ে, একেবারে নিঃসঙ্গ—ফেলে যেতে মন চাইছিল না, কিন্তু মারাত্মক দুর্ঘটনা—যেতেই হলো।

দেখলাম আঠারো-উনিশ বছর বয়স্কা এক সুস্থ সুঠামদেহ কোল মেয়ে খাটিয়ার উপর, একটি উরু দ্বিখণ্ডিত, মধ্যের মোটা হাড় ভেঙে তিন-চার ইঞ্চি বেরিয়ে গেছে, কিন্তু পেশীর কিছু অংশ আটকে রয়েছে। রক্তপাত তখনকার মত বন্ধ। দু'তিনজন সঙ্গিনী নীরবে কাঁদছিল একপাশে দাঁড়িয়ে। তাদের সাহায্যে দেহটিকে টিনমোড়া অস্ত্রোপচারের টেবিলের উপর তোলা হলো।

মেয়েটির কিন্তু কোন বেদনাবোধ নাই। প্রশ্নের উত্তরে বললে, "আমার নাম ফুলমণি, গ্রামে মা ও ভাইবোন আছে। বয়স আঠারো।"

চিকিৎসক ইংরাজীতে বললেন, "পেশীটা কেটে না ফেললে বাঁধা যাবে না, কিন্তু

বেচারী যন্ত্রণায় শেষ হয়ে যেতে পারে, অগত্যা অজ্ঞান করতে হবে ক্লোরোফর্ম দিয়ে—", কথা কটি বলে তিনি চটপট করে একটা কাগজের শঙ্কু আকারের ঠোঙা বানিয়ে তার মধ্যে তুলো পুরে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "ক্লোরোফর্ম ঢেলে দিচ্ছি, তারপর স্থিরভাবে নাকের কাছে ধরুন—"

পেট্রোম্যাক্স-এর আলোটা ঠিক এই সময় দপ্‌দপ্‌ করতে লাগলো কিন্তু আমাদের দুজনের হাত জোড়া।

ডক্টর রায়কে বলা হয়নি যে মাত্র তিন মাস আগে আমাকে ক্লোরোফর্ম করে পেট কাটা হয়েছিল কলকাতায় এবং সেই বিশেষ অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণ মিষ্টি গন্ধ আমার পক্ষে দুঃসহ হতে পারে। কতক্ষণ শ্বাসরোধ করে থাকবো? মাথা ঘুরতে লাগলো। চিকিৎসক সমরাঙ্গণে বহু অস্ত্রোপচার করেছিলেন। তাঁর দুই হস্ত ক্ষিপ্র ও নিশ্চিতভাবে কাজ করে চলেছিল কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যেন অনন্তকাল। প্রবল মনের জোরে সজ্ঞানে থাকলাম কারণ আমি জানতাম যে, এই পরিস্থিতিতে মূর্ছা গেলে কোনদিনই ভয়তরাসে অপবাদ ঘুচবে না।

যাই হোক ফুলমণির বিচ্ছিন্ন পা-টিকে একটি খালি কেরোসিনের টিনের মধ্যে ফেলে, ওকে অজ্ঞান অবস্থায় সঙ্গিনীদের কাছে রেখে আমরা দুজন বাড়ি ফিরে হাত ধুয়ে চা খেলাম। ঘটনার কথা স্ত্রীকে বলা হলো না।

ডক্টর রায় আমাকে বলেছিলেন যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জীবনাবসান হবে মেয়েটির, কারণ হাসপাতালে নিয়ে আসবার আগেই অত্যধিক রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে। তখন মেয়েটির সাময়িকভাবে যন্ত্রণাবোধ ছিল না প্রবল ধাক্কা খাওয়ার ফলে—শরীরের সমাবস্থা বিকল হয়ে পড়েছিল।

ডক্টর রায়কে আমাদের কুটির থেকে নিজের বাসায় যেতে হতো একটি কুসুম গাছের পাশ দিয়ে। আমি এক ফাঁকে বেরিয়ে গিয়ে কর্তিত পা-টিকে তুলে নিয়ে সেই গাছের একটি ডালের ফাঁকে রেখে এলাম, কিন্তু সেই উৎকট কৌতুকের প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়ায় ঠকলাম আমিই। বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার অল্পক্ষণ পরে ঝড়ের মত ফিরে এসে তিনি পরিত্যক্ত চেয়ারখানার ওপর বসে পড়ে বললেন, "মিসেস ঘোষ, আপনাদের পাশের ঐ ছোট ঘরে একটা খাটিয়া ছিল না? শ্যামাচরণের বিছানাটা বোধ হয় একপাশে গোটানো আছে—আজ আমাকে কাছাকাছি থাকতে হবে—মিস্টার ঘোষের বড় স্ট্রেন হয়েছে—সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হয়েছিল—"

আমি বললাম, "বেশ তো, রাত্রের খাবারটা নিয়ে আসুন, ভাগাভাগি করে

খাওয়া যাবে।”

ডাক্তার একটু আতান্তরে পড়লো কিন্তু স্ত্রী বলে বসলেন, “তা কেন? স্টোভে কটা বেশী করে লুচি ভেজে নিলেই হবে। মাংস যথেষ্ট আছে—”

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বাড়তি বিছানা নেই। আমি ডাক্তারকে ভিন্নপথে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফেরবার সময় যথাস্থানে পা-টাকে রেখে দিয়ে ফিরলাম।

ডাক্তার একাধিকবার বলেছে ভূতে বিশ্বাস করে না, সুতরাং সে-রাত্রের অভিজ্ঞতা জানায়নি কোনদিন, তবে সন্ধ্যার পর উক্ত গাছতলা দিয়ে আর যেতে দেখিনি।

ম্যালেরিয়া জ্বর সকলেরই হতো। চিকিৎসকও অব্যাহতি পেলেন না। আমরা ভোরবেলা দেখতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম যে উনি জ্বরের ঘোরে মুখে প্রলাপ না বকে আবোল-তাবোল অনেক কিছু লিখে রাখেন। অকাতরে ঘুমুচ্ছেন দেখে সেই কাগজগুলিকে পকেটস্থ করে চলে আসতাম। অনেক মজার মজার কথা লেখা থাকতো। তখনো তিনি অবিবাহিত ছিলেন। যাকে উদ্দেশ করে অনেক আকূতি। আমি পড়ে শোনালে ভীষণ লজ্জা পেতেন।

॥ ২৫ ॥

প্রথম যুগের হামেশা ম্যানেজার বদল হবার সময়ে চিকিৎসকদের মধ্যে একমাত্র ফণীভূষণ সরকার বেশিদিন কাজে টিকে থাকতে পেরেছিলেন। তার একটি কারণ বোধ করি তাঁর শিকারের শখ ও দক্ষতা। কলকাতা থেকে বড় সাহেবরা অথবা তাঁদের অতিথিবর্গ এলে শিকারে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব চাপতো ক্যাম্পবেল ও এঁর ঘাড়ে। দুজনেরই দুঃসাহস, পশুদের স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞান ও বন্দুকের অব্যর্থ লক্ষ্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

আমি তখন ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদন ও গ্রেডের উন্নয়ন কাজে ঘন ঘন যাতায়াত করছি। প্রধান রাসায়নিক সন্তোষ মিত্রর অতিথি হয়ে থাকি। তিনি তখনও অবিবাহিত এবং চিকিৎসক ফণীভূষণের সঙ্গে একই কোয়ার্টার্স-এ রয়েছেন। আমারও থাকার স্থান হলো সেখানে।

গ্রীষ্মকাল। পাশাপাশি তিনটে খাটিয়া পড়লো ছোট সিমেন্ট-বাঁধানো বারান্দায়। পরদিন বুধবার প্রত্যূষে শিকারে যাওয়ার কথা। তারই প্রস্তুতি সম্বন্ধে

আলাপ-আলোচনা হচ্ছিল শুয়ে শুয়ে অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে। দেওয়ালের গায়ে টোটাভরা বন্দুক দাঁড় করানো আছে। আমার তন্দ্রা এসেছে। চিকিৎসকের কণ্ঠস্বর কানে এলো, "মিস্তির মশায়, বড়বিলের সমস্ত কুকুর চেঁচাচ্ছে কিন্তু আমাদের শ্রীমান নীরব কেন?"

ততদিনে টর্চ-এর প্রচলন শুরু হয়েছে। আলো ফেলা মাত্র দেখি আমার মাথা থেকে প্রায় পাঁচ হাত দূরে একটি শালগাছের সঙ্গে চেন দিয়ে বাঁধা কুকুরের উপর এক চিতাবাঘ বসে আছে।

আমরা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে বন্দুকের প্রতি হাত বাড়াতে বাঘ তার শিকার ছেড়ে সরে পড়লো।

চিকিৎসক ছুটে গিয়ে তাঁর প্রিয় সাদা রঙের লোমশ স্প্যানিয়েল কুকুরটিকে চেন ছাড়িয়ে কোলে তুলে নিলেন। দেখা গেল ঘাড়ের মধ্যে একজোড়া নখের গভীর গর্ত। ক্ষতের মধ্যে কড়া ওষুধ দেওয়া হলো কিন্তু আতঙ্কে অর্ধমৃত পশু টুঁ শব্দও করলো না। বোঝা গেল তার কণ্ঠস্বরের কক্ষ পক্ষাঘাতে নষ্ট হয়ে গেছে। তারপর সে সেই যে খাটের তলায় আশ্রয় নিল আর কোনদিন তাকে বার করা যায়নি।

যে কোন কারণেই হোক আমার শিকারের শখ ক্ষীণ হয়ে এসেছিল, তবে আমারই খাতিরে আয়োজিত অভিযানে উৎসাহের সঙ্গে যোগ না দিয়ে উপায় ছিল না।

সঙ্গে চললেন ক্যাম্পবেল, সন্তোষ মিত্র ও মহেন্দ্রশঙ্কর মাথুর। কারো নদী পার হয়ে আমরা বিটার্স অর্থাৎ পশু-তাড়কদের লিমটুর গ্রাম থেকে তুলে নিয়ে দক্ষিণের পাহাড়টির তলদেশে সন্নিবেশ করলাম। তারপর আমরা বন্দুকধারীরা এক-একটি সুদক্ষ তীরন্দাজ আদিবাসী পথ-প্রদর্শক সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে পিছন দিকের ঘাঁটি অর্থাৎ পশু যাতায়াতের সঙ্কীর্ণ পথগুলো আগলে বসে গেলাম। একটা গভীর নালার খাত হলো আমার ঘাঁটি।

সবেমাত্র একটি গাছের মোটা গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে দম নিচ্ছি, তখনও বিটিং শুরু হবার সঙ্কেত শোনা যায়নি—হঠাৎ দেখি সামনের টিলার উপর দাঁড়িয়ে এক বিরাট শিংওয়ালা সম্বর ঘাড় তুলে এধার-ওধার দেখে নিচ্ছে। মনে হলো দলপতি —বিপদের আশঙ্কা হয়েছে এবং কোন্ পথে পালের পশুগুলিকে নিরাপদে নিয়ে যাবে তাই দেখে নিচ্ছিল।

আমি দু'নলা বন্দুকটি তুলে বড় লৌহপিণ্ডের টোটার ঘোড়া টিপে দিলাম।

বিটের আগে বা আরম্ভে এইভাবে বনানীকে শব্দে আলোড়িত করা শিকারের বিধিসঙ্গত নয়। তার ওপর দেখলাম সম্বর এক বিরাট লম্ফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম আমার ও লক্ষ্যবস্তুর মাঝে অজস্র ঋজু ঋজু শালগাছের কোনটির গায়ে ঠেকে গিয়ে গুলিটি সামান্য দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে থাকবে। আমি লজ্জায় ক্ষোভে মাটির তলায় মিলিয়ে যেতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের কাপড়ে টান পড়লো। দেখি সঙ্গের আদিবাসী শিকারীর চোখ দুটো যেন জ্বলছে। সে একটা তীরের ফলাকা দিয়ে দেখিয়ে দিল আমার নাকবরাবর মাত্র হাত দশেক দূরে আর একটি সম্বর আপন মনে গাছের পাতা চিবোচ্ছে।

বন্দুকের দ্বিতীয় টোটা ছিল এলজি। এবার কোন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। পশু ধরাশায়ী হলো।

সবিস্ময়ে দেখি সম্বরটি স্ত্রীজাতীয় ও সন্তানবতী। শুকনো গাছের ডালে দৃষ্টিবিভ্রম হয়ে সিং দেখেছিলাম, না আগের সম্বরটির সেই অদ্ভুত সুন্দর মাথার দৃশ্য আমার মন থেকে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল জানি না। মোট কথা আমি আমার সঙ্গী ও অন্যান্য শিকারীদের উল্লাসে অংশ নিতে পারলাম না। মরণোন্মুখ পশুর চক্ষুদ্বয়ের নীরব ভর্ৎসনা আজও ভুলতে পারিনি।

সঙ্গীদের মধ্যে কেউ কেউ যখন মাংসের পরিমাণ হিসাব করছিলেন আমি চিকিৎসককে আলাদা ডেকে নিয়ে প্রশ্ন করি, "পশুটি কি শ্রবণশক্তিহীন? বন্দুকের শব্দ না শুনে থাকলেও বারুদের স্ফুটনে বাতাসের ঝাপটে তো সচকিত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা, গেলো না কেন?"

কোন সন্তোষজনক উত্তর পেলাম না। মাথুর শুনছিল, সে বললে, "সেদিন টালাক সাহেবের সঙ্গে শিকারে গিয়ে আমাদের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। মস্ত বড় একটা সিংওয়ালা সম্বর গুলি খেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সাবধানে এগিয়ে গিয়ে কাছে এসে দেখি গায়ে কোন ক্ষতচিহ্ন নেই অথচ নিশ্চল স্পন্দনহীন—যেন বনের পটভূমিকায় আঁকা ছবির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"টালাক সাহেব দেখলেন হরিণের একটা সিং-এর সূক্ষ্ম অগ্রভাগটা গুলির আঘাতে ভেঙে উড়ে গেছে। পশুটি আর কোনও ভাবে জখম না হলেও আচমকা সিং-এর ডগায় ঘা খেয়ে বিমূঢ়ের মত হয়ে গিছলো। টালাক মারতে দিলেন না তাকে। স্পর্শ করতে সম্বরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। তারপর সহসা সে এক লাফ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে যায়।"

মৃত সম্বরটিকে লিমটুর গ্রামে গচ্ছিত রেখে আমরা সেদিন আরও কতকগুলি

পাহাড় পরিক্রমণ করে কিছু পাখি ও একটি কুট্‌রা সংগ্রহ করে শ্রান্ত হয়ে ফিরলাম। আমি একবার খুব কাছ দিয়ে একটি চিতাবাঘ চলে যেতে দেখেছিলাম কিন্তু মারবার চেষ্টা করিনি। আদিবাসী সঙ্গী আমার মুখের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকাতে বললাম, "ওর পেটে বাচ্চা আছে।" লোকটি আমাকে কি ভাবলে জানি না, কারণ চিতাটি পুরুষ ছিল সেকথা সে চিকিৎসককে বলেছিল। পরে সেকথা আমার কানে আসে।

এর পর আমি বহুবার শিকারে গেছি। মানুষখেকো বাঘ মারবার জন্যে তৈরি মাচায় বসে রাতও কাটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কখনো বন্দুক ছুঁড়িনি।

॥ ২৬ ॥

টালাক সাহেব কয়েক বছর পরে কাঠের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কতকগুলি ম্যাঙ্গানিজ ও ক্রোমাইট খনির ইজারা নিয়ে অন্যতম ধনী ও দানবীর হয়ে ওঠেন। আমার সঙ্গে লোকটির সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় আরও অনেক আগে। তাঁকে বলা হতো 'জিম করবিট্ অফ্ উড়িষ্যা', কিন্তু সে কেবল তাঁর দুঃসাহস আর ম্যানইটার বাঘের উচ্ছেদসাধনে প্রতিজ্ঞার জন্যে নয়, তিনি অত্যন্ত মনোজ্ঞ গল্প করতে পারতেন। তফাতের মধ্যে বিনয়ের আতিশয্যে নিজের কৃতিত্বের অনেক অংশ বাদ পড়ে যেত। শুনতে পেতাম অন্য লোকের কাছে। তাঁর কাছে যেসব গল্প শুনতাম তার মধ্যে প্রাধান্য পেতো তাঁর আদিবাসী অনুচরেরা। অনেক কাহিনী হতো অলৌকিক-ঘেঁষা।

একটি ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম বড়বিলে। কলকাতা থেকে সমাগত গণ্যমান্য অতিথিদের আপ্যায়নে বেশ ঘটা করে শিকারের ব্যবস্থা হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশেষ কিছুই পাওয়া যায়নি। শেষ চেষ্টার জন্যে সর্বোচ্চ পাহাড়ের সানুদেশে উঠে বিটারদের ছড়িয়ে দেওয়া হলো ব্যাপকভাবে। মধ্যে দুটি জলাশয় অর্থাৎ 'ওয়াটার হোল' আছে, যেখানে বাইসন হাতি বাঘ সব জানোয়ারই জল খেতে আসে। এবার বড় কিছু পাওয়া অনিবার্য—না হলে মান থাকে না। গাছে গাছে টাঙ্গির আঘাত ও বিটারদের ডাক সবেমাত্র শুরু হয়েছে, এমন সময় দলের নেতা টালাক সাহেবের বিশেষ প্রিয় শিকারী তাদের ছত্রভঙ্গ করিয়ে ছুটে এসে তার প্রভুর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়লো।

তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে লোকটিকে তুললেন। ওদের তো রৌদ্রের তাপে শ্রান্তিতে মাথা খারাপ হবার কথা নয়, তবে শেষ চেষ্টাকে এমনিভাবে নষ্ট করে দিল কেন?

"সাহেব আমার বোনকে বাঘে ধরেছে, এক্ষুনি চলুন—"

"কোথায়? সে আবার কখন এলো?"

"এখানে নয়—গাঁয়ে। কাঠ কাটছিল, ধরে নিয়েছে।"

"কবে?"

"এক্ষুনি। নালার মধ্যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—চলুন।" লোকটি সাহেবের পা জড়িয়ে ধরলো।

বিট যখন নষ্টই হয়েছে আর সূর্যাস্ত হতে বিলম্ব নেই, টালাক সাহেব বিরক্ত হয়ে ফেরাই মনস্থ করলেন, কিন্তু ঐ আদিবাসী লোকটির গ্রামে নামতে চার-পাঁচ মাইল ঘুরপথে যেতে হয়। তাই যেতে হলো। লোকেদের প্রতি টালাকের ভালবাসা ছিল এই ধরনের। অন্যায় আবদারকেও প্রশ্রয় দিতেন।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। দেখা গেল গ্রামের লোকেরা কি ঘিরে যেন জটলা করছে। লোকটি পাগলের মত ছুটে গিয়ে একটি অর্ধভুক্ত মৃতদেহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

নালার মধ্যে থেকে অবশিষ্ট দেহ উদ্ধার করে এনেছে গ্রামের যুবকরা। সেই লোকটির ভগ্নীই বটে।

সেদিন সন্ধ্যার বৈঠকে আদিবাসীদের সাহজিক বোধশক্তি সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শুনি।

অদ্ভুত মানুষ এই টালাক। দরাজ হাত ছিল অতিথি-আপ্যায়নে। সন্ধ্যা হলেই পানীয় বস্তুর প্রত্যাশায় অনেকে জমায়েত হতেন তাঁর বাংলোর প্রশস্ত বসবার ঘরে। হেড অফিসের এক বড়সাহেবকে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করে দিতে নিয়ে গেছি, গল্প জমে উঠেছে—এমন সময় একটি লোক চিঠি নিয়ে এসে টালাকের হাতে দিল। তিনি পরিবেশন চালু থাকার সুব্যবস্থা করে উঠে গেলেন 'আসছি' বলে। আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরেও এলেন। গল্প আবার জমেছে। হঠাৎ কতকগুলি কুকুরের চিৎকার-ধ্বনি শোনা গেল। আমি ব্যাপারখানা দেখে আসবার জন্য দাঁড়িয়েছি, টালাক সাহেব বললেন, "বসুন, ও কিছু নয়। যে বাঘটাকে মেরে আনলাম সেটাকে গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে। পা দেখে মনে হলো রয়ডার সেই মানুষখেকোটা!"

আমরা তো অবাক। কুকুর না চেঁচালে ঘটনাটার কথা হয়ত জানতেই পারতাম না।

ক্যাম্পবেল সাহেবের একটা গল্প দিয়ে আমি বাঘের উপাখ্যান শেষ করবো। সাতষট্টি বছর বয়সে যখন এই চিরকুমার শিকার-পাগল লোকটিকে অবসর নেওয়ানো হলো একরকম জোর করে—তখনও তিনি পাহাড়ী ছাগলের মত তৎপরতার সঙ্গে দিনে চারবার করে পাহাড়ে ওঠা-নামা করছেন। সপ্তাহে একদিন করে শিকারে যাওয়া অব্যাহত রেখেছেন। পেনসন ও জাহাজভাড়া দিয়ে তাঁকে বিলেত পাঠানো হলো। তার পরের বছর আমিও বিলেতে গেছি। সেবার শীত পড়েছিল প্রচণ্ড, তার উপর খাদ্যাভাব। ক্যাম্পবেল আমার হোটেলে এসে একরকম ধরনা দিয়ে বললেন, তিনি ভারতের রোদে পুড়ে মানুষ হয়েছেন, তাঁর পক্ষে বিলেত দেশটা হচ্ছে নরক, অতএব যেমন করে পারি ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

দেশে এসে টালাক সাহেবকে বললাম। তিনি তখন ক্যাম্পবেলকে কেওঞ্জর জেলার আনন্দপুর মহকুমার বউলা ক্রোমাইট খনির ম্যানেজারপদে নিয়োগ করলেন।

ক্যাম্পবেলের তখন উনসত্তর বছর বয়স হবে। একটি জরুরী খবর পেয়ে তাকে দেখতে গেলাম কলকাতার মেট্রোপলিটন নার্সিং হোমে। কর্ণেল আলেকজাণ্ডার অস্ত্রোপচার করছিলেন। একটু বসতে হলো। দেখি ঘাড় থেকে কনুই পর্যন্ত এক-দিকটা বড় বড় স্প্লিণ্ট ও ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া আছে। তৎসত্ত্বেও ক্যাম্পবেল উঠে বসে বললে, "অনেকগুলো হাড় স্ক্রু দিয়ে এঁটে দেওয়া হলো আর যেগুলো কামড়ে কামড়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে সেগুলো যেমন তেমনি থাকলো। ব্যাপারটা ঘটল কাল সকালে। বউলার খড়ছাওয়া বাংলোটায় বসে জুতো পরছি এমন সময় দুটো লোক এসে বললে, 'সাহেব বন্দুকটা নিয়ে চলে আসুন, সেই ব্যাটা তীর-বেঁধা বাঘটা আবার দেখা দিয়েছে—ওটাকে মেরে না ফেললে মানুষ ধরতে শুরু করবে।' কি করি? রাইফেল আনিনি, বারো বোর বন্দুকটা নিয়ে যেতে ভরসা হচ্ছিল না, কিন্তু নতুন এসেছি ম্যানেজার হয়ে—লোকগুলোই বা কি ভাববে না গেলে? ওরা মাইল তিনেক দূরে একটা টিলার উপর তুলে দেখালো। একটা ডোবার ওপারে বড় বড় ঘাসের মধ্যে স্পষ্ট দেখা গেল প্রকাণ্ড ডোরাকাটা বাঘ। ঘাড়টা লক্ষ্য করে গুলি করলাম। লোক দুটো তাদের তীরধনুক নিয়েই পাশের একটা গাছে উঠে গেল তরতর করে। আঙুলে একটা টোকা দিতে যে সময়টুকু

লাগে তার মধ্যেই বাঘ একটা লাফ দিয়ে ডোবা ডিঙিয়ে এসে আমাকে এক থাপ্পড়ে ফেলে দিয়ে হাতটা চিবুতে লাগল। ভাগ্যিস সেই মোটা সোলার টুপি ছিল মাথায় তাই রক্ষা পেলাম, তবু একটা নখে কপালটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেল। পাশ হয়ে পড়েছিলাম কুকরিটার ওপর। নিরুপায় হয়ে কেবল বাঘের নাকে ঘুষির আঘাত করেছিলাম দু'তিনবার মনে আছে, তারপর অজ্ঞান হয়ে যাই। জ্ঞান ফিরে আসে যখন লোক দুটো গাছ থেকে নেমে এসে আমাকে চিৎ করেছে। প্রথমেই হাত মুঠো করতে গিয়ে দেখলাম আঙুল নাড়াতে পারছি, বুঝলাম হাতটা একেবারে ছিঁড়ে পড়েনি। কনুইতে আর একটা হাতের ঠেকা দিয়ে তিন মাইল হেঁটে গিয়ে ক্ষতের ওপর এক শিশি লাইসল আর যেটুকু টিংচার আইওডিন ছিল তাই ঢেলে পঁয়ত্রিশ মাইল ট্রাকে করে এসে অনেক রাত্রে ভদ্রক রেলস্টেশনে মেল ধরে হাওড়ায় এসে টেলিফোন করি। ঘণ্টা-দুই ধরে ধস্তাধস্তি করে সার্জন বললেন, 'ইট ইজ ইন এ মেস্!' কিন্তু নার্ভস যখন জখম হয়নি তখন সেরে উঠবো নিশ্চয়। খারাপ লাগছে বাঘটার কথা ভেবে। লোক দুটো বললে, বাঘটা আমাকে খাচ্ছে দেখে ওরা তীর মারতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু গাছ জাপটে ধরে কিছুই করা সম্ভব হয়নি। মাঝে থেকে একজনের ধনুকটা হাত ফসকে পড়ে বাঘের গায়ে-বেঁধা তীরের ওপর। পড়ামাত্র বাঘটা আমাকে ছেড়ে যন্ত্রণার চোটে ছুটে পালায়। তীর-বেঁধা জায়গাটা নিশ্চয় পচে উঠেছে—একটু আঘাত লাগায় পাগলের মত ছুটে পালায়। এতদিন মানুষ খায়নি কিন্তু এখন থেকে ওটা মরা পর্যন্ত রক্ষা নেই—কত মানুষ মারবে কে জানে!"

প্রশ্ন করলাম, "তোমার মারা গুলিটায় কি হলো?"

"আশা করি কোথাও গিয়ে মরে থাকবে!"

এর পর ক্যাম্পবেলকে দেখি নিউ এম্পায়ার থিয়েটারের প্রেক্ষাগারে। তারপর আবার বিলেতে এক বছর পরে। তখনও হাতটা প্লাস্টারে বাঁধা, কিন্তু তিনি সত্তর বছর বয়সে তাঁর ইংরেজ নার্সকে বিয়ে করে দিব্যি মনের আনন্দে বেঁচে রয়েছেন।

পরে শুনেছিলাম, বাঘটার মৃতদেহ দুদিন পরেই পচা অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়।

নিকোলাস বুনিন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে রুশ কস্যাক্ অশ্বারোহী বাহিনীর নিম্নপদস্থ অফিসার ছিলো। বিপ্লবের পর দেশ থেকে পালিয়ে ব্রিটিশ সেনাবিভাগে যোগ দেয়। তারপর যুদ্ধশেষে তাকে দেখা যায় অস্ট্রেলিয়াতে লোহার আকর সন্ধানীদের ক্যাম্পে। সেখান থেকে সে যায় ওলান্দাজ অধিকৃত সুদূর প্রাচ্যের কোন সোনার প্রস্পেকটিং শিবিরে। স্যার জর্জ-এর সঙ্গে তার যোগাযোগ কেমন করে হলো স্মরণ নেই। একদিন উলিবুরুতে হাজির। ইংরিজী ভাষা তখনও রপ্ত হয়নি, কিন্তু খাটবার ক্ষমতা দেখে সকলেই অবাক।

তখন ঠাকুরানী পর্যন্ত সাড়ে তিন মাইল লম্বা একটা শাখালাইন পাতবার জরিপ শেষ হয়েছে—মাটি ফেলে বাঁধ তৈরি করতে হবে—সেই কাজেই বহাল হলো এই বুনিন। লোকটার ধৈর্য ও অধ্যবসায় দেখে সকলেই খুশি। কোন ভারতীয় ভাষার এক বর্ণও সে জানতো না কিন্তু আদিবাসী শ্রমিকেরা তাকে ভালবেসে ফেললো, যেহেতু সে তার অসুরের মত শক্তি দিয়ে ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কায়িক পরিশ্রমের কাজগুলো করে যেত। রেগে গেলে উগ্রমূর্তি ধরতো, আবার মজা পেলে হাসতো প্রাণ খুলে। ঠিকাদারেরা বলতো এ অভাবনীয় কাণ্ডকারখানা তারা বাপের জন্মে দেখেনি। শ্বেতাঙ্গ অফিসার কোদাল দিয়ে মাটি কোপাবে এমন ব্যাপার কল্পনাতীত, বিশেষ করে যেখানে বাবুরা তো দূরের কথা, মেট-মুন্সীরাও হাতের কাজ করতে নারাজ।

ইংরেজ মালিকেরা দেখলেন লোকটা কাজপাগল আর বাঁধ তৈরীর কাজটা দ্রুতগতিতে সারা হচ্ছে, তাই ম্যানেজারের গোপন চিঠির উত্তরে স্পেনসরকে দিয়ে বলে পাঠালেন মর্যাদা ব্যাপারটা আপাততঃ শিকায় তোলা থাক। মুশকিল হলো যখন একজন রাশিয়ান মহিলা এসে সহবাস শুরু করলেন। তিনি অবশ্য বুনিনের সহধর্মিণী রূপেই পরিচিত ছিলেন, কিন্তু জনরব শোনা গেলো বুনিন সাহেবের বাংলো ক্রমশঃ কলহ-মুখরিত হয়ে উঠছে এবং দাম্পত্যবচসা প্রায়শঃ মারপিটে পরিণত হচ্ছে।

এই ধরনের অবস্থায় অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কলকাতা থেকে বড় মেমসাহেবের আবির্ভাব ঘটে কিন্তু বোধ করি রুশ বর্বরতার সম্মুখীন হতে চাননি তাঁরা। অবশেষে সমস্যার সমাধান করল ম্যালেরিয়া।

এই দর্পহারী মোক্ষম ব্যাধির একপ্রকার নরখাদক জীবাণু আসুরিক শক্তিসম্পন্ন লোকেদের খুব সহজেই ঘায়েল করে দিত। ঠেলে উঠে মগজের ঝিল্লীর মধ্যে আশ্রয় নিত। বুনিনকে গুরুতর ভাবে অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় যেতে হলো। ফিরে আসে একা একরকম হাড্ডিসার হয়ে।

জ্বর আসতো যেতো পালা করে, কিন্তু কাজে উৎসাহ সমান রইলো। স্পেন্সর তাকে সঙ্গে নিয়ে মুখে মুখে ভূবিদ্যা শেখালেন। সে ইংরিজী ভাষা শিখে ফেলল চটপট করে। তারপর পদোন্নতি সত্ত্বেও লোকটির উদ্দাম প্রকৃতি ধাতস্থ হলো না।

ছ'মাসের ছুটি পাওনা হয়েছে। কোম্পানি জাহাজ ভাড়া দেবে বিলেত যাওয়ার। বড় সাহেবদের ইচ্ছে সে লণ্ডন অফিসের আওতায় থেকে একটু কায়দা-দুরস্ত হয়ে আসুক।

হঠাৎ শুনলাম বুনিন ফ্রেঞ্চ মোটর কোম্পানিকে ধরেকয়ে একখানি ক্রাইসলার প্লিমাথ গাড়ি যোগাড় করেছে এই শর্তে যে সে একা গাড়ি চালিয়ে কলকাতা থেকে য়ুরোপের কয়েকটি শহর ঘুরেফিরে আসবে রেকর্ড সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ এমন ঋজু পথ বার করে যাবে, যার উপর দিয়ে কোনও গাড়িই যেতে ভরসা করেনি এর আগে। গাড়ির গুণ বিজ্ঞাপিত হবে সারা পৃথিবীতে।

আমাকে কাজের তাগিদে এই গতিপাগল লোকের গাড়িতে চড়তে হয়েছে একাধিকবার এবং প্রত্যেকবার মনে মনে দুর্গানাম জপেছি। ব্যাক করতেও লোকটা পুরামাত্রায় গ্যাস চালিয়ে দিত। এহেন লোক যদি কোন চ্যালেঞ্জ-এর সম্মুখীন হয় তাহলে মেশিন অথবা মানুষ একটার ধ্বংস অনিবার্য।

এ কথা হুকেনকে বলতে তিনি হেসে বললেন, "ঠিকই বলেছ—তবে এ মানুষ সহজে মরবে না।"

খবর এলো শো-রুম থেকে গাড়ি নিয়ে রাঁচী যাওয়ার পথে গাড়ি ও তার চালককে গুরুতরভাবে জখম অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। আমি হাসপাতালে দেখা করতে গেলে বুনিন বললে, ঐ গাড়িটা নিয়েই সে ঠিক শেড্যুল মত রেকর্ড ব্রেক্ করবে।

তারপর সমস্ত ঘটনাই তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বুনিনের সাফল্য সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করে দেয়।

রাঁচি-পথের দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করে সে বলে যে তখনও সে নিঃসঙ্গভাবে দীর্ঘপথ যাওয়ার সময়ে জেগে থাকার কায়দাটা আয়ত্ত করেনি।

যথাক্রমে বুনিন ম্যানেজারপদে উন্নীত হয়ে জনৈকা অস্ট্রেলিয়ান উড়োজাহাজ

চালককে বিবাহ করে এনে কোম্পানির প্রদত্ত এক অতি রমণীয় বাংলোতে সংসার পেতে বসলো। কিন্তু সে-সুখ তার সহ্য হলো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে যেতে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে গেল মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে। ক্রিট অধিকার করার সময়ে মিলিটারি ক্রশ লাভ করে ফ্রান্স-এর সমরক্ষেত্রে তার অকালমৃত্যু ঘটে।

॥ ২৮ ॥

হয়েগার পায়ের একটা দোষ দেখিয়ে যুদ্ধে যাওয়া থেকে রেহাই পায়। নির্বিরোধ শান্ত প্রকৃতির মানুষ, অনর্থক দৌড়ঝাঁপ করে শক্তিক্ষয় করতে নারাজ। সে উঁচু উঁচু পাহাড়ের ঢালুর ওপরের লোহার আকরগুলোর কাজ সহকারীদের ওপর ছেড়ে দিয়ে ম্যাঙ্গানিজ ধাতুপাথরের খনিগুলো থেকে উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। লোহার চেয়ে ম্যাঙ্গানিজেই লাভ বেশি। মোটা কমিশন পায় কোম্পানি থেকে। উৎপাদন মানে কেবলমাত্র খুঁড়ে মাল তোলা নয়। বড় কাজ হচ্ছে বাছাই করে উঁচু গ্রেডের মালকে তফাৎ করা। লোহা আর সিলিকা অ্যালুমিনার খাদকে যতদূর সম্ভব ছেঁটে ফেলা। এই কাজের জন্য হয়েগার-এর দরকার হতো আমার সাহায্য। আমি ততদিনে ম্যাঙ্গানিজ ঘেঁটে ঘেঁটে, কুমুদ সেন-এর গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করিয়ে করিয়ে একরকম বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছি। তাছাড়া বিক্রি আর রপ্তানির ভার আমার ওপর। দেশ-বিদেশের বাজারদর জানি। অতএব আমাকে ঘন ঘন জঙ্গলে গিয়ে থাকতে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে বার্ড কোম্পানি ছাড়া আরও কতকগুলি ছোট ছোট দেশী খনি কোম্পানি যুদ্ধের সুবাদে বাজারে নেমেছে। বড়জামদা আর বড়বিল রীতিমত জনপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাঠের ব্যবসায়ীরাও সংখ্যায় অনেক বেড়েছে। অসংখ্য ট্রাক এসে গেছে মালবহনের কাজে। সেই সঙ্গে ঝেঁটিয়ে এনেছে কদর্য নাগরিক সভ্যতা যার পরিচয় মিলতো হাটে-বাজারে। বড়বিলের হাট বসতো সপ্তাহে একদিন। মনে হয় এই তো সেদিন এই হাটের প্রতিষ্ঠা করেছিল আমাদের কোম্পানি। সেই অরণ্যের পরিবেশে সাবেক সরল আনন্দকোলাহলে মগ্ন আদিবাসীদের নিয়ে। অবশ্য নিজেদের স্বার্থে, কিন্তু তার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। সে হাটে এখন যে জনসমাগমের রূপ বদলিয়েছে শুধু তা নয়, সস্তা শৌখিন বেসাতির প্রভাবে মানুষের প্রকৃতি হয়ে যাচ্ছে আর এক রকম।

সুবিধের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজের খনিগুলো ছিল আরও অনেক দক্ষিণে ঘন বনের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে। কলকাতা থেকে গেলে উলিবুরু অথবা বড়বিলের কোন বাংলোতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হতো কিন্তু আমি সারাদিন জঙ্গলে গাছের তলায় বসে কাজ করতে ভালবাসতাম।

ইয়েগার তার নিজের পরিদর্শনের কাজ সেরে আমাকে তুলে নিয়ে সুখময় চ্যাটার্জির ল্যাবরেটরিতে হাজির হতো। চীফ কেমিস্ট সন্তোষ মিত্র নিজের স্বাধীন গবেষণাগার খুলে চলে যাওয়ার পর সুখময় সে পদ পায়। তারা দুজনেই ছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের হাতেগড়া ছাত্র। সন্তোষ মিত্র ছিল বয়সে কিছু বড়, প্রকৃতিতে একেবারে আলাদা। সে ছিল ধীরস্থির অচঞ্চল, স্বল্পভাষী ও কৌতুকপ্রিয়। সুখময়ের অন্তরের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল অদম্য, সংক্রামক। সে-ই ইয়েগারকে ম্যাঙ্গানিজ ডায়োকসাইড থেকে ক্লেদ বার করার সহজ উপায় বাতলে দেয়। রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রমাণ দেখিয়ে উৎসাহিত করে, অথচ ইয়েগার যখন কয়েকটি মামুলী যন্ত্রপাতি বসিয়ে নিজের নামে পেটেন্ট নিয়ে বসলো তখন দেখি সুখময় বিভোর হয়ে নিজের শয়নঘরের এক কোণায় রাশি রাশি শালগাছের শঙ্কু নিয়ে এক পাত্রে থাকি রঙ আর এক পাত্রে ভাল ভাল ভিটামিন ও কার্বোহাইড্রেট্‌যুক্ত খাদ্যবস্তু তৈরি করছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললে, "দেশের খাদ্যসমস্যা দূর করবার চেষ্টা করছি, তাছাড়া অতি উৎকৃষ্ট পাকা রঙ তৈরি হচ্ছে কষ থেকে—এই দেখুন তার নমুনা।"

নাকের ডগায় একখণ্ড কাপড় ঝুলিয়ে বললে, "এটাকে সাবানজলে ফুটিয়েছি, রঙ ওঠেনি।"

আমাকে হতবাক দেখে ভাবলো আমি বুঝি কোম্পানির লাভ-লোকসান ছাড়া আর কিছু ভাবতে অক্ষম। গৌরবর্ণ মুখ আরক্ত হয়ে উঠলো। বললে, "মশাই, এই সব গবেষণা অবসর সময়ে করে থাকি, সবই নিজের খরচে—মায় কেরোসিন তেলটা পর্যন্ত—"

বাধা দিয়ে বললাম, "দেশের খাদ্যসমস্যার কথা ভাবছি—আমিও দেশের ছেলে। একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিন।"

তক্ষুনি নরম হয়ে সুখময় বিস্তারিতভাবে বোঝাতে বসে গেলো কবে কোন্ গ্রামে কোন্ আদিবাসীদের দেখেছিল শালগাছের ফল থেকে কষ বার করে ফেলে দিয়ে বাকি সারবস্তুকে বেটে সুস্বাদু করে খাচ্ছে—সেই থেকে কিছুটা নমুনা নিয়ে বিশ্লেষণ করিয়ে আনে—তারপর সে হিসাব করে দেখে সারা ভারতবর্ষের শালপ্রসূ

জায়গাগুলিতে কত ফল অনর্থক নষ্ট হচ্ছে। তার অর্ধেককেও খাদ্যে পরিণত করতে পারলে দেশের অন্নাভাব চিরতরে দূর হয়ে যায়।

বক্তৃতা-শেষে বলে, "কাল আসবেন, এই জিনিস দিয়ে চকোলেট বানিয়ে খাওয়াবো।"

সুখময় অভিমানী লোক। নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া আমার নিজের কৌতূহলও আছে। পরদিন কাজ সেরে সন্ধ্যার আগে উপস্থিত হলাম। একটি চীনামাটির পাত্রে কয়েকটি বরফির আকারে কাটা খয়েরী রঙের মিষ্টান্ন এল। তার মধ্যে থেকে কিছু তুলে নিয়ে মুখে পুরে গিলে ফেললাম। বললাম, "নাই বা হলো চকোলেট, কোকো-গন্ধী চালের পুলি এত ভাল হয় না।"

কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হলো না সে।

আর একবার হঠাৎ গিয়ে দেখি একখণ্ড আয়ত জমি খুঁড়ে গর্ত করে তার মধ্যে কাঠ জ্বালিয়ে চুল্লি করে ম্যাঙ্গানিজ ধাতুপাথর পোড়ানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য তাপে অক্সাইড বার করে দিয়ে শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ ম্যাঙ্গানিজকে আটচল্লিশ ভাগে পরিণত করা।

আমি যখন অঙ্ক কষে দেখালাম যে তার এ প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে কাযকরী হলেও খরচে পোষাবে না, তখনও একটুও দমে না গিয়ে সুখময় তার গবেষণার কাজ চালিয়ে গেলো। অদম্য তার উৎসাহ।

ইয়েগার সন্তোষ মিত্রের মত ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। সে আমার কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উঠতি-পড়তি বাজারের সকল বৃত্তান্ত মন দিয়ে শুনে নিত। জানতো আসল লাভটা হচ্ছে ডায়োক্সাইড থেকে আর সেক্ষেত্রে গ্রেডের সামান্য তারতম্যে দামের তফাৎ হয় অনেকখানি। আমাকে কাছে পেলে প্রতিদিন সঙ্গে নিয়ে উঁচু গ্রেডের ম্যাঙ্গানিজ আকরগুলি ভাল করে দেখে নিত।

ভদ্রাসাই ছাড়িয়ে সিদ্ধমঠ বনের মধ্যে ঢুকে আমি সহজে বার হতে চাইতাম না। অন্য কাজ না থাকলে ইয়েগারকে বলতাম ঘুরে ফেরবার সময় তুলে নিয়ে যেতে। কেন জানি না এই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলে মনটা কেমন উদাস হয়ে যেত। যতবার গেছি ঐ একই অনুভূতি হয়েছে।

অনেকবার ভেবেছি ভদ্রাসাই, কাসিয়া, রুগুডি, জোডা, মালদার মাঝে এই উটকো সংস্কৃতি-ঘেঁষা নাম সিদ্ধমঠ কোথা থেকে এল? কোথাও কোন মঠের ধ্বংসাবশেষ তো নেই। একটিমাত্র পথ ভিতর দিয়ে গেছে, তাও অল্পদিন হলো হয়েছে, বুনিন-এর হাতে তৈরি। কাছাকাছি ত্রিশ মাইলের মধ্যে কোন জনপদ

নেই। নদীও ক্রোশদেড়েক দূরে। তবে এ নাম কেমন করে হলো আর এই সব গাছের আশ্রয়ে এলে এমন প্রশান্ত আনন্দময় হয়ে ওঠে কেন মন?

বছর পাঁচেক পরে আবু পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে দিলওয়ারা মন্দির আর জৈনদের মঠ থেকে কিছু দূরে গাছপালার মধ্যে অনেকটা এইরকম এক অনুভূতি হয়। সেকথা আমার সঙ্গী আমেদাবাদের পুস্তকবিক্রেতা দিঙ্কারভাই ত্রিবেদীকে বলি।

তিনি বলেন, "তুমি বোধ হয় জানো না, রাজস্থানের মরুভূমি এতখানি ছড়িয়ে পড়বার আগে এই আবু পাহাড়ে লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ন্যাসীর বাস ছিল।"

"তারা এখন কোথায়?"

"জানি না, পাঁচ-সাতশ' বছর আগেকার কথা বলছি—হয়ত তাদেরই প্রভাব আজও আমরা অনুভব করি।"

॥ ২৯ ॥

তখনও পালুড্রিনের আবিষ্কার ও প্রচলন হয়নি। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসেবে ছোট ছোট হলুদ-রাঙা মেপাক্রিন খাওয়ানো হচ্ছে। কোম্পানির সাহেব ডাক্তারের নির্দেশে নিয়মিতভাবে তাই খেয়ে খেয়ে ইয়েগার-এর সমস্ত শরীরটা হলদে হয়ে গেলো। চোখ দুটোও বাদ পড়লো না। তারপর অনিদ্রা আর মানসিক অবসাদ বিকারে পরিণত হওয়ার উপক্রম হতে তাকে কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে যেতে হলো।

এবার তার জায়গায় আনা হলো একজোড়া ইংরেজ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারকে। কোম্পানির আশা দুই সাহেব পরস্পরকে সঙ্গ দিয়ে খুশি রাখবে। তারা ম্যাঙ্গানিজের ঝামেলা কেমিস্ট চ্যাটার্জি আর জিওলজিস্ট টাপলুর ওপর ছেড়ে দিয়ে লৌহ উৎপাদনের সহজ কাজে মন দিল। ম্যাঙ্গানিজের অবহেলার ব্যাপারে বড়কর্তাদের মধ্যে একজনের হাত ছিল। তিনি এসেছিলেন মার্টিন বার্ন কোম্পানি থেকে, লোহা বিক্রি বাড়াবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে। ডিপার্টমেন্ট-এর ভার নিয়ে লোহার উৎপাদনে জোর দিলেন। ম্যাঙ্গানিজ খনিঅঞ্চল থেকে ভাল ভাল সুপারভাইজারদের সরিয়ে নেওয়া হলো লোহার কাজে। কতকগুলি আকর বন্ধই করে দেওয়া হলো। আর দেখতে দেখতে সেই সকল পরিত্যক্ত খাদানগুলিকে

গ্রাস করে নিল সাবেক আদিম জঙ্গল।

ছ'মাস পরে বিদেশে ছুটি কাটিয়ে ফিরে দেখি ম্যাঙ্গানিজ বিভাগের চরম দুরবস্থা। সুখময় কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবে বলে একজন কচ্ছি অংশীদার যোগাড় করেছে। তার উচ্চাশা সন্তোষ মিত্রের মত গবেষণাগারে আবদ্ধ রইলো না। সে চাইলো আগে ঐশ্বর্যশালী হয়ে নিতে। বিজ্ঞানের গবেষণা মন্দির ছেড়ে নেমে এলো কেনা-বেচার বাজারে। উপসংহারে কি হলো সেটা আমার বলবার প্রতিপাদ্য নয়। আমি ফিরে এসে দেখলাম ক্যাম্পে অভিজ্ঞ কর্মী আর নেই।

রাধাকৃষন্ টাপলুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ফাইলে গাঁথা চিঠিপত্র পড়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূবিদ্যায় এম. এস-সি পাস। কর্মঠ, বুদ্ধিমান, চট্‌পটে কিন্তু বেজায় আডবুঝ আর রগচটা। কোথাও টিকতে পারেনি বেশিদিন। জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার কাজ ছেড়ে ইরানে চলে যায়। সেখানেও বেশিদিন থাকেনি। সম্প্রতি আমাদেরই বিসরা চুনা পাথরের কাজে ঊর্ধ্বতন অফিসাদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসেছে। ওকে বাগমানানো মুশকিল, অসম্ভব বললেই হয়। মাথার ওপর কেউ নেই বলেই ম্যাঙ্গানিজ খাদানের কাজে বদলি হয়ে এখনও টিঁকে রয়েছে। বড়বিলের কাছে ভাগিয়াবুরুর একটি বাংলোতে থাকে। সেখান থেকে দীর্ঘ পথ গিয়ে চালু খনিগুলো দেখে আসে।

লোকমুখে শুনলাম একেবারে 'বারুদ'। কখন কোন্ কথার স্ফুলিঙ্গ তার মগজের বিস্ফোরক পদার্থকে স্পর্শ করে বিপর্যয় ঘটাবে তার কোন ঠিক নেই।

কয়েক মাসের মধ্যে এই কাশ্মীরী যুবকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ মিললো।

লোহা-পাগল ডিরেক্টরটি বিলাতের অফিসে বদলি হয়ে চলে গেলেন। খনি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত নতুন বড়কর্তা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কোম্পানির অর্ধবার্ষিক লাভ-লোকসানের হিসাব পড়তে দিয়ে বললেন, "লাভ কমে গিয়ে মাত্র দেড় লক্ষে দাঁড়িয়েছে—ব্যাঙ্কের কাছে কর্জ বেড়েই চলেছে—কেবল লোহা উৎপাদনে এত-খানি জোর দিয়ে ভুল হয়েছে—তুমি কি করতে পারো?"

বললাম, "চেষ্টা করে দেখতে পারি—কিন্তু একটানা অনেকদিন খনিঅঞ্চলে থাকতে হবে।"

সেই আমার দ্বিতীয় দফা অরণ্যবাস। এবার পাহাড়ের ওপর খুব সুন্দর বাগান-ঘেরা ডায়রেক্টার্স বাংলোর একটি দিক আমার জন্যে সংরক্ষিত থাকবে

জানতাম। ছুটিতে যাওয়ার আগেও পরিদর্শনে গেলে সেই ব্যবস্থাই হতো। সেখান থেকে অন্য সকল অফিসারদের বাংলো, অফিস ও দোকানপাট কাছে। টাপলুর বাসস্থানও বেশি দূর নয়। সে শৌখিন লোক। কাশ্মীরী আসবাবপত্র, কার্পেট আর বেভকভারে ঘর গুছিয়ে রাখে। কাজের ক্ষেত্রে মেজাজ যেমনই হোক না কেন সামাজিকতায় তার ছিল দিলদরিয়া প্রাণ। উপাদেয় জিনিস খেতে আর খাওয়াতে ভালবাসতো। সেইজন্যে সন্ধ্যার পর তার ঘরে আড্ডা জমতো।

আমি প্রথম দিন খনিতে পৌঁছে স্থানীয় কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সামাজিকতা সেরে নিয়ে টাপলুর বাংলোতে গিয়ে হাজির হলাম। সেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। আমি যে ম্যাঙ্গানিজের উৎপাদন বাড়াবার উদ্দেশ্যে এসেছি সেকথা সে জানতো বলে আমার ওপর মনে মনে রেগে আছে তার আঁচ পেয়েছিলাম। একটা ছুতো তুলে তর্ক জুড়বে এই ছিল তার স্বভাব। কিন্তু তার সুযোগ সে পেলো না। আমি পরিচিত অপরিচিত সকলের সামনে বহুদিনের বন্ধুর মত হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় বসে গেলাম। করমর্দন করে আলাপ করার দরকার হলো না। ইউসুফের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গল্প ফাঁদলাম বৃদ্ধ জিওলজিস্ট পারসান্স-এর। ১৯১৮ সালে তিনিই সর্বপ্রথমে বার্ড কোম্পানির হয়ে উড়িষ্যার এই অঞ্চলে লোহা আর ম্যাঙ্গানিজের খোঁজ করতে আসেন। তখন অবশ্য তিনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় হলেও তরুণ। চক্রধরপুর থেকে গরুর গাড়ি করে জগন্নাথপুর আসতে হয়—তার পর থেকে অধিকাংশ পথ করে নিতে হয় জঙ্গল কেটে। ক্যাম্প পড়ে সেরেণ্ডা জঙ্গলের একপ্রান্তে হোরোমোটোতে। পাঁচ বছর পরে আমি যখন আসি তখন তিনি টাটা কোম্পানিতে কাজ করছেন আর কোন জায়গায়। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। পরিচয় ছিল না। সেদিন মাত্র কয়েক মাস আগে, পূর্ব-আফ্রিকার কিলিমানজারো পাহাড়ের কোলে হঠাৎ তাঁর আবির্ভাব। কোম্পানির ম্যানেজিং ডায়রেক্টর। নাইরোবি থেকে এসেছিলেন কায়নাইট পাথরের খনি পরিদর্শনের কাজে। ভারতীয় দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। প্রবাসী ভারতীয়দের এই সব ব্যাপারে উৎসাহ নেই সে-কথা সর্বজনবিদিত। ইংরেজ খনি ম্যানেজার আমার পরিচয় করিয়ে দেবার সময় বললেন, আমি হচ্ছি টাভেটার স্টেশন মাস্টারের আত্মীয়। অর্থনীতির অধ্যাপক, আপাততঃ বিলাতে বসে ব্রিটিশ কলোনিগুলির শ্রমশিল্পের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছি।

আসল পরিচয়টা লুকিয়েছিলাম। নইলে খনি দেখা সম্ভব হতো না। বৃদ্ধের চোখে কৌতুকের আভাস দেখলাম। মুহূর্তকাল কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। গাড়িতে

তুলে নিয়ে একটা পাহাড়ের তলা পর্যন্ত গিয়ে তরতর করে ওপরে উঠে গেলেন। আমাকে বাধ্য হয়ে পিছন পিছন উঠতে হলো। বোধ করি এই করে বুঝে নিলেন আমি পাহাড় চড়ায় অভ্যস্ত। তারপর একটু দম নিয়ে তিনি এমনভাবে সেখানকার ভূপৃষ্ঠের পুরাবৃত্ত বোঝালেন যেন কতই আমি সে বিদ্যা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর অভিজ্ঞ। তারপর আমাকে নামিয়ে নিয়ে ক্যান্টিনে খেতে বসিয়ে হঠাৎ বললেন, "খুব খুশি হলাম আলাপ করে—ভারতবর্ষের প্রতি আমার টান ছেলেবেলা থেকে। বার্ড কোম্পানির ম্যাঙ্গানিজ আর লোহাখনির ইজারা নেওয়ার কাজে আমার কর্মজীবন শুরু হয়। তারপর ঢুকি টাটা কোম্পানিতে—সেখানে থাকতে চৌদ্দ বছর কাটে ভারতের বনেজঙ্গলে আমার।" তখন দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা।

গল্প দিয়ে টাপলুর হৃদয় জয় করে নেওয়া খুব সহজ। সে চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করলো, "হাও ডিড্ হি গেস?"

বললাম, "ভারতবর্ষ আর আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও যে এ পাথর পাওয়া যায় না—প্রতিযোগীর গন্ধ পাওয়া যায়। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত আমাকে অপদস্থ করেননি।"

গল্প শেষ করে ভূবিদ্যাতে আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। পকেট থেকে দুখণ্ড পাথর বার করে বললাম, "সিঙ্কমঠ খাদানে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

দেখালাম কঠিন মসৃণ সিলিকা পাথরের মধ্যে ফার্ন জাতীয় লতাপাতা যেন শিলীভূত হয়ে গেছে।

টাপলু হেসে বললে, "ওটা ফসিল নয়—ম্যাঙ্গানিজ সলয়ুসান ঢুকে ঐরকম চিত্র-বিচিত্র হয়েছে।"

"তা হলে এমন নিখুঁতভাবে দুদিকে সমতা থাকলো কেমন করে?"

সে-কথার উত্তর না দিয়ে সে হেসে বললে, "এসব হালের পাথর। এখানে ফসিল পাওয়া গেলে সারা বিশ্বে হইচই পড়ে যাবে।"

এত লোকের সামনে নিজের বিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পেয়ে সে আমার প্রতি তার অন্তরের বিরোধ ভুলে নিজের হাতে কফি করে খাওয়ালো।

পরের দিন ভোরবেলা ড্রাইভারকে ক্যাম্পে রেখে আমি নিজে গাড়ি চালিয়ে টাপলুকে তুলে নিতে গেলাম। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গাড়ির গতি মন্থর করে তাকে বললাম আমার ছেলেবেলাকার ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা। প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলাম যে তার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা পাওয়ার সুযোগ আমার হয়নি। এখনও শিক্ষানবিশী চলেছে।

এবার টাপলু নিঃসংকোচে নিজের পারিবারিক ইতিহাস বলে ফেললো। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পরিবারের একমাত্র সন্তান। গুরুজনেরা শৈশবেই বিয়ে দিয়ে দেয়। অল্প বয়সে একটি কন্যার জন্ম দিয়ে তার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটে। তারপর থেকে সে ঘরছাড়া। আর বিয়ে করবার প্রবৃত্তি হয়নি। কষ্ট করে মেসে থেকে পড়াশোনা করেছে। কোন রকমে পরীক্ষায় পাস করে চাকরিতে ঢোকে কিন্তু টিকতে পারেনি কোথাও। দু-দিন যেতে না যেতে সামান্য কোন কারণে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। এর জন্যে দায়ী তার গুরুজনেরা। ছোটবেলায় তাঁরা সামান্য কারণে অথবা অকারণে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে তাকে আধমরা করে দিতেন। একবার অপরাধের মধ্যে রাস্তা থেকে একটা সিগারেটের খালি প্যাকেট কুড়িয়ে পেয়ে তার মধ্যে পেনসিল আর রঙিন খড়ি রাখে। দেখতে পেয়ে প্রথমে পণ্ডিতমশায় নিজে এক-প্রস্থ হাতের সুখ করে নেন, তারপর তাকে তুলে দেওয়া হয় বাবা-জ্যাঠার হাতে। কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি সত্য কথা বলার। সেই থেকে তার মন বিগড়ে যায়।

এর আগে টাপলু আর কারও কাছে নিজের মনকে অনাবৃত করেছে কিনা জানি না। আমিও শুনছিলাম একাগ্রভাবে মন দিয়ে। সহানুভূতির স্পর্শ সে পেয়ে থাকবে।

গাড়ি থেকে নেমে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে নামতে আমরা কুন্দ্রা নদীর গিরিপথের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। একপাশে ডক্টর স্পেন্সার আবিষ্কৃত বিখ্যাত ম্যাঙ্গানিজ ডায়োক্সাইড-এর আকর। অন্যদিকে নদীর ওপারে টাটা কোম্পানির ইজারা নেওয়া জোড়া পাহাড়। খানিকটা সমতল জমির ওপর দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জংলী আম গাছ দেখিয়ে বললাম, "ক্যাম্পের জন্য কি অপূর্ব জায়গা! আজ থেকে এখানেই থেকে গেলে কেমন হয়?"

টাপলু প্রথমে ভাবলো রসিকতা করছি, তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গরম গরম কি একটা কথা বলতে যাচ্ছে—আমি বাধা দিয়ে বললাম, "আমি নিজের কথা বলছিলাম টাপলু—"

সে বললে, "ডিসেম্বর মাসের দারুণ শীতে পাহাড়ের মাঝে এই ফাঁকটুকু দিয়ে হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। সূর্য পশ্চিমে ঢলুক টের পাবেন। তাছাড়া দরকারটাই বা কি? কাজ করবার লোকজনেরা তো সেই দূর থেকে আসবে। শীতকালে নটার আগে কেউ এসে পৌঁছয় না।"

"মেট-মুন্সীরা কখন আসে?"

এবার একটু ইতস্তত: করে টাপলু বললে, "ঐ একই সময়ে—"

"কাজ শুরু হতে হতে দশটা বাজে ?"

"এই দারুণ শীতে তা বাজে—", স্বীকার করলো টাপলু।

এবার আমি কথা ঘুরিয়ে জানতে চাইলাম তার ইরানের অভিজ্ঞতার কথা, কাশ্মীরের শীতের কথা।

একবার টাপলু উষ্মার সঙ্গে বলে ফেললো, 'কাশ্মীরী ছেলে যে শীত সহ্য করতে পারে, বাঙালীর পক্ষে তা দুঃসাধ্য।"

আমি তখনই চেপে ধরলাম, "তাহলে এটা একটা চ্যালেঞ্জ—বেশ এখনই ব্যবস্থা কর। আমরা এক তাঁবুতে থাকবো। তোমার মত পুরু রেজাই আমার নেই। বাংলো থেকে দু'চারটে কম্বল আনলেই হবে, চল তোমাকে ভদ্রাপাইতে পৌঁছে দিচ্ছি। সেখানে ট্রাক আর জীপ পাঠাতে বলে এসেছি—তাঁবু আর জিনিসপত্রের ব্যবস্থা তোমার।"

গাড়িতে উঠে টাপলু বললে, "বুঝেছি কালকে সব ব্যবস্থা করে এসেছেন—আপনার আর কি! দুবেলা বাংলোতে গিয়ে খানাপিনা করবেন।"

বললাম, "শুনেছি তুমি লোক খাওয়াতে ভালবাস। তোমার রাঁধবার লোকটি নাকি ওস্তাদ! আমাকে তোমার অতিথি করে নিতে পারবে না ? বাছা, কাজ তো করবে তুমি, আমি ঐ অতি সুন্দর পরিবেশের মধ্যে থেকে—"

"আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে হেড অফিসের বড় সাহেবদের কাছে ক্রেডিট নেবেন ?"

মনের কথা চেপে রাখতে পারতো না টাপলু। ভাগ্যবানের প্রতি ঈর্ষা ওর মজ্জাগত। তবে একটু মিষ্টি করে কথা বললে খুশিতে গলে যেতো।

আমি জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে বললাম, "আমি তোমার অতিথি। বেশি কটু কথা বলতে পারবে না জানি তবু একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—এই বিরাট বাণিজ্য-সংস্থার বড়কর্তাদের অত বোকা ভেবো না। কে কি কাজ করছে, কতখানি ফাঁকি দিচ্ছে তার কিছুই অজানা থাকে না তাঁদের। প্রত্যেকের প্রতি প্রখর দৃষ্টি থাকে।"

আর বলতে হলো না। বিকেলের দিকে আমার বাক্স-বিছানা নিয়ে ফিরে এসে দেখি ইলাহী কাণ্ড। শতাধিক শ্রমিক আম গাছ দুটির নিচের প্রশস্ত জায়গাটাকে ইতিপূর্বেই জঙ্গলমুক্ত করে বিরাট একটা তাঁবু খাটাচ্ছে। খুশি হয়ে অন্য কাজে গেলাম।

॥ ৩০ ॥

জায়গাটা ভারি নির্জন। আমাদের সেই পঁচিশ বছর আগেকার উলিবুরু পাহাড়ের ক্যাম্পের চেয়েও নিস্তব্ধ, নিঝুম। দুদিকের পাহাড় ঘন জঙ্গলাকীর্ণ। দৃষ্টি চলে না। পাশ দিয়ে খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে। তার কলধ্বনি মৃদু, অবিশ্রান্ত। নীরবতার মধ্যেই আবিষ্ট। মাত্র কয়েক মাস আগে এই একই নদীর কি দুর্দান্ত প্রকৃতি ছিল তার প্রমাণ মেলে উপড়ে-পড়া গাছের বড় বড় কাণ্ড আর তটের উপরের কঠিন পাথরগুলোর আকৃতি দেখে। ক্যাম্পের এই জমিটাও গত বর্ষার এক সময়ে জলের তলায় ছিল, তার চিহ্ন মেলে পাহাড়ের তলায় তলায়। বাঁকের দুদিক এখনও প্রশস্ত।

একটি বাঘ প্রতিদিন পাহাড়ের ঢালুর ওপর দিয়ে ওদিকের নদীর বাঁকে জল খেতে যায়। সেদিনের হইহল্লার সময়েও তাকে দেখা গিয়েছিল। তার পরদিন থেকে কাজের তাগিদে ফিরতে অন্ধকার হয়ে যায়। দেখার সুযোগ পাইনি তবে গুর্খা চৌকিদারেরা বলে ও নাকি চলার পথে একটু থেমে তাঁবুগুলোকে ভাল করে নিরীক্ষণ করে যায়।

টাপলুর পশুশিকারে শখ নেই। আমি অনেক বছর হলো বন্দুক স্পর্শ করিনি। এতদিনে এইটুকু প্রত্যয় হয়েছে যে আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রের দরকার হয় না।

এই বাঘটির সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হলো বুধবার হাটের দিনে। সেদিন কেউ ছিল না ক্যাম্পে। আমি ইচ্ছে করেই একটু এগিয়ে গিয়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করছিলাম। ভেবেছিলাম আমাকে দেখতে পাবে না। মনের ভেতর সতর্কতার সঙ্কেত পেয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখি, বাঘটি নিচে দিয়ে চলেছে। তার অভ্যাসের ব্যতিক্রম হয়নি। হয়ত ক্যাম্প জনশূন্য দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে নেমেছিল। একবার দাঁড়িয়ে স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখে চলে গেলো। অদ্ভুত সুন্দর মনে হলো শরীরের গঠন ও গতি। ক্যাম্পের এত কাছ দিয়ে গেছে সেকথা টাপলুকে বললাম না। পরে উৎপাদনের কাজে বারুদ দাগা বৃদ্ধি পেলে সে আর কোথাও চলে যায়।

প্রথম রাতেই টাপলুর এক উৎকট রসিকতার নমুনা পেয়েছিলাম। সেদিন একটু দেরি করে তাঁবুতে এসে দেখি, সে নিজের ক্যাম্পখাটের পাশে একটা লোহার কড়ায় কাঠকয়লার আগুন করে দিব্যি একটা মোটা রেজাই মুড়ি দিয়ে বসে

বসে গড়গড়া টানছে। মনে হলো চোখেমুখে দুষ্টু হাসি। ভাবলাম মনে করেছে, আমি শীতে কাতর হয়ে ক্যাম্পবাসের সঙ্কল্প ছেড়ে দেবো।

সেদিন বড়বিল থেকে রাত্রের খাওয়া সেরে এসেছিলাম। এক কাপ গরম চা খেয়ে শুয়ে পড়লাম। পেট্রোম্যাক্স বাতি আর কাঠকয়লার অঙ্গারে তাঁবুটা একটু তেতে থাকলেও মাঝে মাঝে কোথা থেকে বাতাস ঢুকে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত রাতপোশাকের ওপর সোয়েটার ও তার ওপর মোটা একটা কোট চাপিয়ে দুজোড়া কম্বলের মধ্যে ঢুকলাম। কিন্তু তাতেও শীত গেলো না।

মধ্যে একবার উঠে বাইরে যেতে হলো, কারণ টাপলু শৌচের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি। কাছাকাছিই একটি গাছের পাশে দাঁড়িয়েছি। একফালি চাঁদের কিছু আলো থাকায় বাতি আনিনি। শরীরের অনাবৃত অংশ অসাড় হয়ে যাচ্ছিল হিমে। হঠাৎ দুদ্দাড় করে একদল সম্বর একরকম গা ঘেঁষে ছুটে পালালো। জল খেতে এসে থাকবে। আর একটু হলে গুরুতর আঘাত পেতাম।

ফিরে এসে আর শোয়া হলো না। কড়ার আগুনে নতুন করে কাঠকয়লা চাপিয়ে আঁচ গনগনে করে বসে গেলাম কাছে। কিছুক্ষণ পরে দেখি আমার ক্যাম্পখাটের পাশ দিয়ে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। দেখি গায়ের কাছে দুটো বড় বড় জানালা। কেবলমাত্র জালের আস্তরণে মোড়া। সারারাত হু-হু করে বাতাস ঢুকেছে সেদিক থেকে। ঢাকার কাপড় গুটিয়ে তোলা ছিল অন্ধকারে টের পাইনি।

গরম চা আসতে টাপলু তার মোটা রেজাই-এর মধ্যে থেকে মুখ বার করলো।

"ঘুম কেমন হয়েছে?" প্রশ্নের ভঙ্গীতেই বুঝলাম যে আমার দিকে একটা বাতাস ঢোকার পথ রেখেছিল ইচ্ছে করে।

সপ্তাহকাল যেতে না যেতে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেলাম।

॥ ৩১ ॥

টাপলু রোজই বিকেলের দিকে কোন-না-কোন অছিলা করে বড়বিলে পালায়। আড্ডা দিয়ে ফেরে রাত আটটার পরে। ততদিনে শীতটা আমাদের একরকম গা-সহা হয়ে গেছে। একলা থাকতে আমার ভালই লাগে। বরং ও কাছে না থাকলে চিঠিপত্র টাইপ করার সুবিধে হয়। নিরিবিলিতে লেখাপড়াতেও মন বসে। তার ওপর ছেলেবেলায় ডায়েরি লেখার বাতিক এখনও ধরে আছি।

টাপলু তার ভণিতা আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলাম, "তুমি তোমার সমবয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গ চাইবে তার জন্যে জবাবদিহি দেওয়ার কি আছে! বরং মাঝে মাঝে কিছু তফাতে থাকলে দুজনেরই নার্ভ একটু স্বস্তি পায়। তবে দোহাই তোমার, রেডিওটা সঙ্গে নিয়ে এস না।"

ও বলে, "ওটা তো বিজলী ছাড়া চলবে না!"

বললাম, "এক সেট জেনারেটার আনিয়ে নিন—নিদেনপক্ষে ঘড়ির সময়টা মিলিয়ে দেখতে পারতাম—"

তারপর কি কথা স্মরণ হতে খুব খানিকটা হেসে বলে, "আপনাদের উলিবুরু ক্যাম্পে তো সে ভাবনা ছিল না।"

গল্পটা আমি বলেছিলাম। একদিন মহাসমস্যা দেখা দিল। দুপুরে অফিস-তাঁবুতে ফিরে দেখি আমার হাতঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। সময় জানতে গিয়ে দেখি ক্যাম্পে সকলেরই ঘড়ি কোন-না-কোন কারণে বন্ধ হয়ে রয়েছে। হয় আমার মত দম দিতে ভুলে গেছে কিংবা কোন যান্ত্রিক কারণে বিকল। ঘড়ি-মালিকদের নিয়ে গোপনে পরামর্শ সভা বসলো। একমাত্র কেশবাবুর শৌচে যাওয়ার সময়টা সুনিশ্চিত। জঙ্গলে জরিপের কাজে অথবা তাঁবুর বাইরে মানচিত্র আঁকবার সময় যেখানেই থাকুন না কেন, ঠিক আটটা বাজলে দেখা যেত ঘটি হাতে গাছের আড়ালে চলেছেন। তাঁর কোন ঘড়ি ছিল না। গাছের ছায়া দেখেই সময় নিরূপণ হয়ে যেত। আমরা তাঁকে আমাদের সংকটের কথা না বলে ওৎ পেতে বসে রইলাম। সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন দূরে যেতে হয়নি। চালু ঘড়িগুলি একরাত্রি বন্ধ থেকে সকাল আটটার সময় পুনরায় সচল হয়। জঙ্গল-জীবনের আদিকালের গল্পের মধ্যে এই ঘটনাটি কেন জানি না গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেতো।

যাই হোক টাপলু তার ভটভটিয়া চড়ে সশব্দে অদৃশ্য হয়ে যেতে আমি কাজে মন দিলাম।

শ্রমিকেরা সন্ধ্যা হবার আগেই দলবদ্ধ হয়ে বাড়ি ফেরে। এখন আর মশালের যুগ নেই। ওদের মধ্যে কারো কারো হাতে দেখা যায় হারিকেন লণ্ঠন, অনেকের হাতে থাকে এ্যালুমিনিয়ামের পাত্র। আরামের মান কিছু কিছু বেড়েছে সন্দেহ নেই। আমরা দুজন সকাল থেকে কাজের জায়গায় উপস্থিত থাকায় শ্রমিকেরা হাজিরা দিচ্ছে সময়মত। ফলে চুক্তির কাজে আয় দিচ্ছে বেশী।

ওদের কলধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার পর একমাত্র জলপ্রবাহের আওয়াজ ছাড়া কানে আসে চৌকিদার আর পানিওয়ালা পাচকদের মধ্যে অস্পষ্ট আলাপ-

আলোচনা। বুনো মোরগ, হরিণ, ময়ূর আর অন্যান্য বনবাসীর ডাক প্রকৃতির স্বভাব বলে মেনে নিয়েছি। চমক লাগে না আর।

সময় কেটে যায় হু-হু করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লেখা আর উত্তরের প্রত্যাশাও সময় হরণের একটা অতিরিক্ত কারণ হয়ে উঠেছে। আপনজনের সংখ্যা বেড়েছে।

সেদিন দুপুরে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে এসে টাপলু জানায় যে মালবাহী এক ট্রাকের তলায় পড়ে একজন শ্রমিক মারা পড়েছে। পুলিস ময়নাতদন্তে নিয়ে যেতে এসে দেখে লাশ লোপাট। নিশ্চয় সেই হতভাগা ট্রাক-মালিকের কাজ। রাত্রের অন্ধকারে পুঁতে ফেলেছে কোথাও।

আমি বলি, "শ্রমিক তো ওরই—তোমার আমার মাথাব্যথায় কাজ কি!"

আজ সন্ধ্যার পর ক্যাম্প-কটের ওপর আরাম করে বসে একখানি বই পড়ছি, দূর থেকে শুনতে পেলাম টাপলুর মোটর সাইকেলের শব্দ। মনে হলো অন্যদিনের চেয়ে আরও দুর্দান্ত বেগে গাড়ি চালিয়ে আসছে। অনর্থক নিজের জীবন বিপন্ন করবার দুশ্চেষ্টার প্রতিবাদে দুটো কড়া কথা শোনাতে যাচ্ছি, কিন্তু ওর চোখমুখের ভাব দেখে নির্বাক হয়ে গেলাম।

সে ধুলোময়লাসুদ্ধু বিছানায় বসে পড়ে বললে, "সেই লোকটার আত্মা আমার পিছু নিয়েছিল—"

"কোন লোকটার?"

"যাকে পুঁতে ফেলেছে তারা—"

"তাই বল। তোমার সঙ্গে স্পীডে পেরে উঠলো না বুঝি?"

টাপলু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে, "আমি ঠাট্টা করছি না। ওকে চোখে দেখিনি কিন্তু রাস্তার ঐ মোড় থেকে অনেকখানি পথ কখনও সামনে কখনও পিছনে 'টাপলু' 'টাপলু' বলে সমানে ডেকেছে।"

সেদিন খাওয়ার পর টাপলু আর ভূতের গল্প শুনতে চায়নি। বললে, "সকাল হলে হয়। একশ' লোক লাগিয়ে ঐ লাশ উদ্ধার করে সৎকারের ব্যবস্থা করবো।"

আমি বললাম, "হেড অফিস থেকে খবর এসেছে উপদেষ্টা ভূতত্ত্ববিদ হল সাহেব আসছে। ওর ধারণা খনিতে ঢোকবার মুখের ঐ গভীর শুকনো নালার মধ্যে থেকে কয়েকশ' টন ভাল গ্রেডের মাল উদ্ধার করা যেতে পারে। অতএব ঐ একশ' শ্রমিককে এই কাজে লাগিয়ে দিলে তোমার আখেরের কাজ হবে—শেষ পর্যন্ত তোমাকে তো ওরই তাঁবে থাকতে হবে!"

টাপলু তখনকার মত হাঁড়িমুখ করে উঠে গেলো।

পরের দিন দেখলাম আমার উপদেশমত নালার দুপাশের আগাছা পরিষ্কার করিয়ে মাল তুলিয়ে বড় বড় চাটা বানিয়ে ফেলেছে। বোঝা গেলো অতীতকালে বাছাই-করা ভাল গ্রেডের ম্যাঙ্গানিজ ডায়ওক্সাইড বর্ষার জলের ঠেলায় নিচে গিয়ে পড়েছিল।

হল এসে তার ধারণাকে প্রমাণিত হতে দেখে টাপলুর ওপর সকল আক্রোশ ভুলে গেলো।

সেদিন আমার বড়বিলে কাজ ছিল। টাপলু বললে তার কোমরে ব্যথা—সে ক্যাম্পেই থাকবে।

কোম্পানির ড্রাইভাররা রাতে জঙ্গলে থাকতে চাইত না। সেইজন্যে একটি ল্যাণ্ডরোভার গাড়ি আমি নিজেই চালাতাম। সঙ্গে খালাসী গোছের একজনকে নিতাম। সেদিন বড়বিলের সামাজিকতা সেরে ফিরতে একটু বেশি রাত হয়ে গেলো। ভদ্রাসাই থেকে সিদ্ধমঠ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গাড়ির গতি কমিয়ে দিলাম। বড় বড় শালগাছের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আঁকাবাঁকা উঁচু-নিচু পথ গাড়ির উজ্জ্বল আলোতে সংকীর্ণ গুহার মত দেখাচ্ছিল। মন আমার আনন্দে আপ্লুত।

হঠাৎ শুনতে পেলাম মিষ্টি গলায় ডাক—"টাপলু" "টাপলু"! খুব কাছে। তার পরেই দূর থেকে উত্তর এল, "টাপলু" "টাপলু"!

একটু চমকে গিয়ে গাড়ি থামালাম। এবার ডাকটা শুনলাম আরও কাছ থেকে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি মগডালে বসে একটি পাখি ডাকছে, "টাপলু" "টাপলু"!

হাসি চেপে গম্ভীরভাবে খালাসীকে বললাম, "শুনা থা, কোই টাপলু সাবকো বুলা রাহা—"

লোকটি বোধ করি তন্দ্রার ঘোরে কিছুটা আচ্ছন্ন ছিল। ডাকটাও যে ঠিক টাপলু ছিল বলতে পারি না। তবে মনে করলে ঐরকম ঠেকবে। তাছাড়া আমি যা বলবো বেচারা খালাসীর তাতে সায় না দিয়ে উপায় নেই।

বললে, "হাঁ সাব—"

গাড়ি চালিয়ে দিয়ে ওকে বললাম, "আমি হয়ত ভুলে যাব, তুমি টাপলু সাহেবকে বলো।"

টাপলু আরাম করে গায়ে লেপ জড়িয়ে শুয়ে ছিল। আমার পিছন পিছন এসে

খালাসী সেলাম করতে সে জিজ্ঞাসুভাবে চাইলো। আমি বললাম, "বেচারা ভয় পেয়েছে—"

ধড়মড়িয়ে উঠে টাপলু প্রশ্ন করতে আমি বললাম, "ঠিক হ্যায় যাও, হাম ভি শুনা হ্যায়—"

আমি বেশ একটু রঙ চড়িয়ে সেই জায়গাটার নৈশ রূপের বর্ণনা দিয়ে অপঘাতে মৃত শ্রমিকের আবির্ভাব আর তাকে কাতরভাবে আহ্বানের কথা বললাম, "ভেবেছিল তুমি গাড়ির মধ্যে আছ—ঘুরে ঘুরে কেবল তোমাকেই ডাকলো—বেচারা খালাসী তো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার উপক্রম—ভাবলো বুঝি প্রেতটা তার পাশে গাড়ির মধ্যে বসেই 'টাপলু' 'টাপলু' বলে চিল্লাচ্ছে।"

টাপলুর মুখখানা কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে বললে, "আই ডোণ্ট বিলীভ ইন গোস্টস্।"

॥ ৩২ ॥

বুধবারে বডবিলের হাট, মঙ্গলবারে জোডার, সোমবারে নোয়ামুণ্ডির। জোডা কাছে কিন্তু আমাদের লোকজনদের ছুটি হতো বুধবার দিন। সেদিন সকাল থেকেই টাপলু বডবিল যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পডতো।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চিঠিপত্র লিখতে বসতাম। দূরে নদীর বাঁকে কোল মেয়েরা স্নান করতে আসতো। একদিন লিখতে লিখতে ক্লান্ত হয়ে আমি টাপলুর লম্বা টেলিস্কোপটা তুলে নিয়ে সেইদিকে ঘুরিয়েছি। সুঠাম, সুডৌল, চিক্কণ কালো কয়েকটি কোল মেয়ে অনাবৃত দেহে জলে নেমেছে। এরা সকলেই দিনমজুর। যৎসামান্য আয়। ভাল করে খেতে পায় না কিন্তু কি অদ্ভুত সুস্থ দেহ, শরীরের কি অপর্যাপ্ত লাবণ্য। আনন্দে উচ্ছলিত মন। আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

হঠাৎ দৃষ্টিপথ রুদ্ধ হয়ে গেলো। যন্ত্রটি সরিয়ে দেখি নালদা দপ্তরের বড় চৌকিদার এসে সামনে দাঁড়িয়ে মিলিটারি কায়দায় স্যাল্যুট করছে।

লজ্জা গোপন করে জিজ্ঞাসুভাবে চাইতে সে হাতে একখানি চিঠি দিল। হেড অফিস থেকে বড় সাহেবরা খনি-পরিদর্শনে আসছেন আগামী কাল। আমি যাতে ক্যাম্পে থাকি সেই অনুরোধ করে গুডউইন চিঠি দিয়েছে। লোকটিকে বিদায় দিয়ে আমি টেলিস্কোপটিকে যথাস্থানে রেখে দিলাম।

এই কোল মেয়েদের দেখলে অনেক সময়ে আমার মন চলে যেত ছেলেবেলায়।

নাইরোবি রেল পল্লীটি তখনও শহরে পরিণত হয়নি। মাত্র তিন-চার বছর হলো পূর্ব-আফ্রিকার শাসনকেন্দ্র মোম্বাসা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সেখানে এসেছে। কিকুয়ু, মাসাই, নান্দী, সোমালী, ওয়াকাম্বা ইত্যাদি নানা উপজাতির লোকেদের দরবার করতে আসতে হতো তাদের সাবেক বেশভূষায়। যাওয়া-আসার পথ ছিল আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে। কাঠের তৈরি বাংলোর বারান্দায় ঝিলমিলের আড়াল থেকে আমরা তিন ভাইবোন বিস্ময়াবিষ্ট চোখ সহজে ফেরাতে পারতাম না। দরবারের উমেদার ছাড়াও পাহাড় থেকে সেই পথে নেমে আসতো গ্রামবাসী মেয়েরা তাদের পণ্য আর শিশুদের পিঠে ঝুলিয়ে। উল্টা দিক দিয়ে দীর্ঘাঙ্গী ব্রাগাণ্ডা মেয়েরা গির্জায় যেত আলখাল্লার মত ঢিলা পোশাক পরে আর যেত বিচিত্র-বেশী গোয়ান নরনারী শাড়ি ও গাউনের মিশ্রণে।

লুকিয়ে থেকে মানুষের এই বিচিত্র মিছিল দেখার মোহ আজও ছাড়তে পারিনি। এইসব খনিঅঞ্চলে নিজেকে সযত্নে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে না পারলে মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা যায় না।

টাপলু সূর্যাস্তের আগেই ক্যাম্পে ফিরে এলো। তাকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, "দেখছো, এরই মধ্যে উঁচুদরের মাল উৎপাদনের হার দ্বিগুণ করে ফেলেছো বলে বড় কর্তারা বেজায় খুশি। সকলে সদলবলে আসছেন। তাঁদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে আকরের গভীর গর্ত থেকে মাল আর রদ্দিবোঝাই ট্রামগুলিকে টেনে তোলবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা করতে পারলে তোমার মত উদ্যমশীল কাজের লোক উৎপাদনকে দশগুণ বাড়িয়ে ফেলতে পারে।"

টাপলু খুশি হয়ে বললে, "একটা বেশি পাওয়ারের ইঞ্জিনচালিত উইঞ্চ হলেই হবে—"

সমর্থন জানিয়ে বললাম, "নিশ্চয়, আপাতত কিছুটা 'উইণ্ডো ড্রেসিং' করে রাখা দরকার।"

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে সমস্ত প্রশস্তি যে একমাত্র তারই প্রাপ্য সেকথা আমি প্রকাশ্যে প্রচার করে ওর মনের সন্দেহভঞ্জন করেছি। স্তুতিবাদে কে না খুশি হয়! মুশকিল হচ্ছে, ওর কতকগুলি স্বভাবজাত বিশৃঙ্খল অভ্যাসকে ব্যবস্থাধীনে আনা। ঘরসজ্জায় মার্জিত বোধ আছে কিন্তু কখন কোথায় কি ফেলে রাখে সে সম্বন্ধে কোন হুঁশ থাকে না। আমি গুছিয়ে রাখতে গেলে লজ্জা পায়, অথচ সমালোচনা

সহ্য করতে পারে না।

খেঁকিয়ে উঠলো, "উইণ্ডো ড্রেসিং! আমি কি তাঁবুটা আস্তাবল করে রেখেছি নাকি?"

বললাম, "তাঁবুটা না হে, খনিটা—"

ছুটির পরের দিন শ্রমিকেরা আসে দেরি করে। আমরা ঠিক করলাম রয়ডাবস্তি থেকে কয়েকজন মেট-মুন্সী আনিয়ে নিজেরাই ইতস্তত ছড়ানো সন্ত-বারুদে-ওড়ানো ম্যাঙ্গানিজ ডায়ওক্সাইডের চাঙড়গুলো, যন্ত্রপাতি, চালনী, ঝুড়ি সব কিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখবো। চৌকিদার পাঠিয়ে লোক ডাকার ব্যবস্থা করা হলো।

সবেমাত্র নিশ্চিন্ত হয়ে রাত্রের খাওয়া সেরে একটা গল্প শুরু করেছি এমন সময়ে প্রবল বেগে ঝড় উঠলো। তাঁবুর প্রবেশ-পথ বন্ধ করে দিয়ে টাপলু বললে, "মেঘের ঘনঘটা দেখে এসেছিলাম। এখন ঝড়ের যা জোর দেখছি, তাতে 'উইণ্ডোড্রেসিং'-টা ভাল করেই হবে—", তার কথা আটকে গেল মুখে। অসময়ের ঝঞ্ঝাবর্ত গিরিপথের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাঁবুর একদিকটা উপড়ে নিল। টাপলু যেন মুহূর্তের মধ্যে ভিন্ন মানুষ হয়ে গেলো। বাতাসের হুঙ্কার আর প্রবল বৃষ্টির শব্দের ওপরে কণ্ঠস্বর তুলে আমাকে বাইরে যেতে নিষেধ করে তড়িৎগতিতে বেরিয়ে গেলো। আমি উঠে দাঁড়িয়ে মধ্যের বড় পোলটিকে ঋজু করে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে থাকলাম। জলের ঝাপটের শব্দ কমতে ঝড়ের দাপটের এক ফাঁকে টাপলুর কণ্ঠধ্বনি কানে এলো। মনে হলো লোকজনদের কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁবু রক্ষা করা গেলো না। বাতাসের উদ্দাম দাপাদাপিতে একেবারে কাত হয়ে পড়তে আমি কোনরকমে অক্ষতদেহে নীচের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসে অল্প চাঁদের আলোতে দেখি টাপলু দড়িদড়া ছেড়ে দিয়ে খিল খিল করে হাসছে। আমাকে সরীসৃপের মত বেরিয়ে আসতে দেখে, না প্রকৃতির তাণ্ডবলীলায় তার মনে উল্লাসের সৃষ্টি হলো আজও জানি না।

আমি আমগাছের বিরাট গুঁড়ির আড়ালে আশ্রয় নিয়ে, ঠাণ্ডাতে অসাড় হয়ে বসে বসে দেখলাম টাপলু একবারও না থেমে প্রথমে চৌকিদার-পাচকদের তাঁবু, তারপর আমাদের তাঁবু খাড়া করে তুললো।

ততক্ষণে জল-ঝড়ের দাপট বন্ধ হয়েছে, কিন্তু শীত প্রচণ্ড। আমি একেবারে জমে গেছি।

সব কাজ গুছিয়ে তাঁবুর মধ্যে গনগনে আগুন পোহাতে বসা পর্যন্ত টাপলুর মুখে হাসি ফুটেই রইলো। যেন খুব একটা মজা হয়েছে এমনি ভাবখানা।

ঠিক এই একই হাসি দেখেছিলাম টাপলুর মুখে আরও বছর তিন-চার পরে। আমি তখন অন্ধ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, রেওয়া, রাজস্থান ইত্যাদি অনেক জায়গায় নানাপ্রকার ধাতুপাথর খোঁজাখুঁজি আর কেনাকাটি করে বেড়াচ্ছি। মধ্যে বিদেশেও ঘুরে এসেছি লম্বা ছুটিতে। উড়িষ্যার খবর বড় একটা রাখি না। হঠাৎ জরুরী চিঠি পেলাম শ্রমিকদের সঙ্গে খনি ম্যানেজারদের বিরোধ বেধেছে। গুলিগোলা চলেছে। টাপলু ভীষণভাবে প্রহৃত হয়ে জামশেদপুরে টাটা কোম্পানির হাসপাতালে পড়ে আছে। তাকে যেন পত্রপাঠ দেখে আসি। গিয়ে দেখি ক্ষতবিক্ষত দেহে শয্যাশায়ী, কিন্তু মুখে সেই হাসি। কোন শ্রমিকের বিরুদ্ধে ওর নালিশ নেই। কবুল করলো নিজেই মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারেনি।

আমি নিজেকে কিছুটা অপরাধী বোধ করছিলাম, কারণ আমিই ওকে বড়বিলের নির্বিঘ্ন পরিবেশ থেকে সরিয়ে আট-দশ মাইল দূরে রয়ডা শ্রমিকবস্তির কাছে জঙ্গলের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য করি।

কোম্পানির অবস্থা সচ্ছল হয়ে ওঠবার পর যখন নদীর ধার থেকে তাঁবু উঠিয়ে নেওয়া হয় তখন টাপলুর ইচ্ছে ছিল সে তার সাবেক ভাগিয়াবুরুর বাংলোতে ফিরে যায়। আমি হাঁ-না কোন কথা না বলে তাকে নিয়ে যাই রয়ডার উপত্যকায়। তখন পাহাড়ে পাহাড়ে ঘনবদ্ধ সবুজ গাছপালার মাঝে মাঝে লাল রঙের ছড়াছড়ি। অনেক মহীরূহে নতুন পাতা গজিয়েছে। মধ্যের উর্বর সমতল জমিটা যেন সারাক্ষণ রঙ-বদল করতে থাকে। কখনও কচি কলাপাতা রঙের আস্তরণে বেগুন-রঙা চৌখুপি খোপের ছড়াছড়ি। কখনও বা গাঢ় হলুদ-রঙা গুঞ্জাফুলের গালিচায় ছেয়ে আছে। মধ্যিখান দিয়ে লাল কাঁকর গভীর করে কেটে ঝর্ণার জল যায় ছলছলিয়ে। বর্ষার সময় সারা উপত্যকাময় ধাপে ধাপে শত শত ঝর্ণার ধারা কলকলিয়ে নামতে থাকে।

সেদিন উপত্যকাটি কি রূপ ধারণ করেছিল বলতে পারি না তবে স্মরণে আছে চারদিকে নানা স্তরের সবুজের মাঝে লাল রঙের সমারোহ দেখিয়ে টাপলুকে বলেছিলাম, "প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য দেখবার জন্যে এখানে একটা 'গ্র্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড' বানিয়ে ফেললে কেমন হয়?"

সে বলে, "আসল উদ্দেশ্যটা বলেই ফেলুন না—আশেপাশের প্রতিটি পাহাড়ে ম্যাঙ্গানিজের আকর আছে—স্পেলার ডিপসিটও বেশি দূরে নয়—অতএব তাঁবুটা—"

বাধা দিয়ে হেসে বলি, "ঠিক ধরেছ তবে তাঁবু নয়, আরও পাকাপোক্ত ব্যবস্থা

করতে হবে—তোমার মেট-মুন্সীদের কাছে কোদাল, চুন, ফিতে আর দড়িদড়া আছে—আনিয়ে নেওয়া যাক—”

কি জন্যে চাইছি কোন অনুমান করতে না পেরে টাপলু আনিয়ে নিল সব কিছু। বললাম, “বেশ, এবার তোমার আমার ছুটি কাটাবার উপযোগী একটা সুন্দর বাংলো বাড়ির নক্সা এঁকে ফেলা যাক মাটির ওপর। এই ধর এদিকটায় সামনের বারান্দা—”

আমরা যেন কতই খামখেয়ালী খেলার ছলে চুন দিয়ে প্রমাণ সাইজের ছবি আঁকছি এমনিভাবে মাটির ওপর নক্সা এঁকে ভিত কাটবার হুকুম দিয়ে এলাম।

ঠিকাদার দিয়ে চটপট করে বাড়ি উঠে গেলো। অল্পদিনের মধ্যেই টাপলু সেখানে জমিয়ে বসলো। তার স্বভাবগুণে অতিথি-অভ্যাগতর অভাব হলো না, কিন্তু কে জানতো দু-তিন বছর যেতে-না-যেতে সেখানকার শ্রমিকেরা মারমুখো হয়ে উঠবে!

ততদিনে বোধ করি গুডউইন ও তার সহকারী মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার চলে গিয়ে কয়লার খনিঅঞ্চল থেকে জেনকিন্স্ এসেছে। আরও আগে থাকতে তাদের মাথার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বিসরা চুনা আকরের জেনেরাল ম্যানেজার মার্কেশেলী। কাদের বা কার দোষে এখানকার শ্রমিকেরা বিগড়ে গিছলো জানি না। আমি যখন টাপলুকে দেখতে যাই তখন চার মাসের লক-আউট চলেছে।

যথাসময় টাপলু নিরাময় হয়ে উঠলো। দীর্ঘ চার মাসের ‘লক-আউট’ও তুলে নেওয়া হলো কিন্তু টাপলু আর ফিরলো না। কাজও চালু হলো না। যেহেতু শ্রমিকেরা নাকি তখনও ক্ষেপে রয়েছে।

॥ ৩৩ ॥

আমার ডাক পড়লো। কাজ চালু করে দিয়ে আসতে হবে। আশ্বাস দেওয়া হলো, পাহারা-ঘেরা ডায়রেক্টার্স বাংলোয় থাকবো। প্রত্যেক দিন একগাড়ি বন্দুকধারী সেপাই আমাকে উপদ্রুত খনিঅঞ্চলে নিয়ে যাবে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

আমি বললাম, “না। টাপলুর পরিত্যক্ত বাংলোয় আমি কেবলমাত্র আমার স্ত্রীকে নিয়ে থাকবো। কোন চৌকিদার পর্যন্ত থাকবে না। এমন কি কোন

গাড়িও কাছে রাখবো না।"

শুনে কর্তারা হতাশ হলেন। বিপদ-সম্ভাবনার ঝুঁকি তাঁরা নিতে পারেন না জানিয়ে দিলেন।

আমি বুঝিয়ে বলি, আমার সম্বন্ধে হঠকারিতার লেশমাত্র নেই। শ্রমিকদের বিশ্বাস অর্জন করতে হলে একেবারে শুধু হাতে যেতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। আমার নিরাপত্তার জন্যে ভাবনা নেই।

বিপদ দূরের কথা সেবার কোন গ্লানিকর অভিজ্ঞতাও আমার হয়নি। ম্যাঙ্গানিজ আকরগুলিকে ভাল করে চালু করে দিয়ে আমি টালাক সাহেবের প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কিছু অংশ ক্রয় করে ডিরেক্টর-পদে নিযুক্ত হই। ছ'মাসকাল চীন ও জাপান পর্যটনের পর ফিরে এসে বাসা বাঁধি কুন্দ্রা নদীর ধারে, খাড়া পাহাড়ের ঢালুর ওপর, গভীর জঙ্গলের মধ্যে। অঞ্চলটির স্থানীয় নাম চোরমালদা।

এবারের বনবাসে আমি স্বাধীন। টালাক সাহেব অবসর নিয়ে বিলাতে চলে গেলেন। আমি প্রথম থেকেই বড়বিল থেকে বিজলী উৎপাদনের যন্ত্রটি নিয়ে আসতে অস্বীকার করি। পেট্রোম্যাক্স-এর মত শব্দকর আলোর বদলে নিয়ে গেলাম আলাদিন বাতি আর সাধারণ হারিকেন লণ্ঠন। ঘর দুটো হলো পরিমিত পরিসরের। পাহাড়ের ঢাল ভরাট করে তৈরি হলো বারান্দা আর খোলা চত্বর। চারপাশে বিঘা দুই জমি উদ্ভিদমুক্ত করে এমনভাবে ডালপালার বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়া গেলো যাতে দৃষ্টি ব্যাহত না হয়। ইজারার মধ্যের গাছগুলিকে সরকারের কাছ থেকে কিনে নিয়ে রক্ষা করা হলো। আকাশস্পর্শী মহীরুহগুলি এতদিন রক্ষা পেয়েছিল কেমন করে জানি না। বোধ করি নদীগর্ভ ছিল ট্রাক চলাচলের প্রতিবন্ধক। কিছু দূরে বৈতরণী নদীর ওপরও সেতু তৈরি হয়েছে মাত্র সম্প্রতি।

আমার এই নতুন বাসা ঘনবদ্ধ গাছ দিয়ে ঘেরা থাকলেও ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি চলে যেত বেশ কিছুদূর, বিশেষ করে পাতা ঝরার সময়ে। ঠাকুরাণী-ভদ্রাসাইর জঙ্গলের মত এখানে লতাগুল্মের দুর্ভেদ্য জাল নেই। মাঝে মাঝে সূর্য ও চাঁদের আলো ঢুকে পড়ে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতো। কোন কোন দিন শত শত পাখি কোথা থেকে এসে ক্ষণিক রঙের ইন্দ্রজাল দেখিয়ে উড়ে যেত। কখনো বাতাসের প্রবল ধাক্কায় বড় বড় শাল গাছ থেকে হাজার হাজার শঙ্কু ঘুরতে ঘুরতে সামনের খোলা অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়তো।

একদিন কোন বন্ধুর শিশুকন্যাকে লিখলাম—

"বিকেল বেলা জুড়িয়ে গরম ঝড়টা এল প্রবল বেগে
বেরিয়ে এসে অবাক লাগে শালগাছেদের কাণ্ড দেখে।
নাচছে তারা হাত-পা মেলে মাথায় নিয়ে মেঘ-তরী,
শালের ফলে ধাওয়া করে মত্ত বাতাস ভর করি,
ঠিক মনে হয় হেলিকপ্‌টার বাচ্চাগুলোর পঙ্গপাল
মনে হচ্ছে স্বর্গ হতে পুষ্পমালার পড়ছে জাল।
নদীর জলে ছলছলিয়ে উচ্চরোলে বেড়ায় ছোটে
পাহাড়গুলোর শ্যামলতা অন্ধকারে আরও ফোটে।
মধ্যিখানের গিরিপথে ঘেঁটিয়ে আসে জলের ধারা
লাল-কালো সব পাথরগুলো হাসতে থাকে আপনহারা।"

শীতের শেষ থেকে বর্ষার শুরু পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই বাতাস প্রখর উত্তাল হয়ে উঠতো বিকেলের দিকে। একসময়ে ঝরাপাতার সোনালী, হলুদ, পাটকিলে ও বাদামী রঙের ছড়াছড়ি মাতামাতিতে আমাদের বেড়া-ঘেরা প্রশস্ত প্রাঙ্গণটি হিল্লোলিত হয়ে উঠতো। গিরগিটি বহুরূপীরা তখন মসৃণ পাথরের চাঙড় ছেড়ে পাতাশূন্য ডালগুলির ওপর চড়ে বসে ধ্যানমগ্ন হতো।

বড় বড় গাছগুলোর সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যে যেন একটা ব্যক্তিগত মমতার সম্বন্ধ গড়ে উঠলো। সে মমতাবোধকে উভয়মুখী মনে হতো যখন মানুষের সঙ্গ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বারান্দায় বা শানবাঁধানো খোলা চাতালের ওপর শুয়ে-বসে থাকতাম।

বড়বিল থেকে চৌদ্দ মাইল বিস্তৃত এই জঙ্গলপথটি নদীনালা-সঙ্কুল বন্ধুর হওয়ায় অনাবশ্যক মানুষের সঙ্গ এঁটে ফেলা সহজ হয়েছিল।

বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে যারা এসে পড়তো স্নেহের টানে তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল জিওলজিস্ট শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও তার অনন্যসাধারণ সাহসিনী সহধর্মিণী মায়া। আরও আসতো দুই দিলীপ বসু। একজন অনুকূলচন্দ্র বসুর সুযোগ্য পুত্র—বার্ড কোম্পানির বর্তমান খনি-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্‌ ও আর একজন বোলানী আয়রনের ভূবিদ্যা-বিশারদ। এরা সকলেই বয়সে তরুণ, কাজে উৎসাহী, উৎপাদনের যন্ত্রীকরণে বিশ্বাসী।

আমি নিরাসক্ত কৌতুহলভরে নতুন যুগের এই সব আশাবাদীদের কথা শুনতাম। স্বীকার করতাম যে দ্রুত বৃদ্ধিশীল মানুষের অশন-বসনের ব্যবস্থা করতে হলে উৎপাদন পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে যন্ত্রীকরণ ছাড়া উপায় নাই কিন্তু নিজেকে কোন পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত করতে চাইনি।

গাছপালা ছাড়া বনের পশুর সঙ্গেও আমাদের একটা রফা হয়ে গিছলো। বেড়ার বাইরে তাদের অবাধ গতি। আমাদের দিক থেকে কোন বিপত্তির সৃষ্টি হবে না। তারাও বেড়ার ভেতর অনধিকার প্রবেশ করবে না। আমরা গরু-ছাগল জাতীয় লোভনীয় কোন খাদ্যবস্তুকে কাছে রাখবো না। জালকানা পশুদের সুবিধার জন্যে চাতালের বাইরে আগুন জেলে রাখবো রাতভোর।

দেখা গেলো মোটামুটি ভাল্লুকেরা পর্যন্ত সে ব্যবস্থামত চলে। জ্যোৎস্না রাতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লাগিয়ে দিলে আমরা বারান্দার থামের আড়াল থেকে দেখি।

হরিণ দেখা যায় পাহাড়ের নিচে শ্রমিকদের বস্তি ছাড়িয়ে কুন্দ্রাপানি খনির দিকে যেতে।

বাঘের সাক্ষাৎ মেলে কদাচিৎ নদী পারাপারের পথের কাছে। হাতি ও বাইসন হরেন চ্যাটার্জির রেল পাতার যুগ থেকেই কয়ড়ার দিকে সরে গেছে।

তিনি ছিলেন টাটা কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। ১৯৩৩ কি ৩৪ সাল ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। এপ্রিল মাসে তাঁর লোহার পাত দিয়ে তৈরি ক্যাম্পে থাকতে গিয়ে শীতে প্রায় জমে যাই।

মিটার-গেজ রেল পাতা হয় ভদ্রাসাই থেকে জোড়া হয়ে মালদা পর্যন্ত। লোকো চলাচল শুরু হলে বোধ করি হাতি-বাইসনেরা আর কোন জলের জায়গা খুঁজে নেয়।

হরেনবাবুর কাছেই শুনি আমাদের সেই উলিবুরুর ইউসুফ মালদার কাছে ক্যাম্প করে আছে। তখনকার দিনে সেদিকের পথ দুর্গম হলেও ভোজনবিলাসীরা অনেক কষ্ট স্বীকার করে তাঁর ক্যাম্পে গিয়ে জুটতো। ইউসুফের অতিথিপরায়ণ-তার কথা আগেও শুনেছিলাম। একদিন মাথুর সাহেব, সন্তোষ মিত্র ও আমি জঙ্গল ভেঙে হাজির হই। পথে ময়ূর, হরিণ আর বনমোরগ দেখেছিলাম অজস্র। বাঘ, ভাল্লুক ও হাতি-বাইসনের গল্প শুনি। অনেকদিন পরে আমাকে পেয়ে ইউসুফ জোর করে ধরে রাখে।

তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি কোনদিন শখ করে সেখানে থাকতে যাব।

॥ ৩৪ ॥

একদিন বারান্দার একদিকে বসে আছি একাকী। মন চলে গেছে কোন্ ছেলে-বেলায়। হঠাৎ দেখি সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো সেই ছেলেটি যে ছত্রিশ বছর আগে আমাকে জরদগ্ধ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় চাইবাসা থেকে কলকাতায় নিয়ে গিছলো। তারপর ওকে কয়েক মাসের মধ্যে একবার মাত্র দেখেছিলাম। সেই হাসি। সেই কথা বলার ভঙ্গি। বদলের মধ্যে কেবল চুলে পাক ধরেছে আর ফর্সা রং তামাটে হয়ে গেছে। অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "ব্যানার্জি না? তুমি কোথা থেকে?"

আমাকে তার চিনতে পারবার কথা নয় কারণ আমার চেহারা অনেক বদলে গেছে। শুনে থাকবে আমিই সেই বার্ড কোম্পানির ঘোষ। বললে, "মনে আছে! কলকাতায় আপনাদের বাগবাজারের বাসায় ডাক্তার কালীপদ ঘোষ ইন্‌জেকশন দেবার পর জ্ঞান হলে আমি চলে আসি, তারপর এক মাসের মধ্যেই তো ডাঙ্গোয়াপোসিতে দেখি ফিরে এসেছেন—আর দেখা হয়নি—আমি এখন টাটা কোম্পানির মালদা ম্যাঙ্গানিজ খনির ম্যানেজার। আপনার প্রতিবেশী।"

বড় ভাল লাগলো পুরনো দিনের গল্প করে। বিদায় নেওয়ার আগে সে বলে গেলো টাটা কোম্পানির লোহার খনিগুলির উৎপাদন যন্ত্রীকরণের হিড়িকে যে সকল নতুন নতুন কর্ণধারেরা এসেছে তাদের কাছে তার মত অভিজ্ঞ লোকের কোন মূল্য নেই। কর্মশক্তি ও স্বাস্থ্য অটুট থাকলেও ও এখন ফালতু।

ক'দিন পরে কোন কাজে বড়বিল গিয়ে দেখি দত্তমশায়ের দোকানের সামনে একটা ভাঙা চেয়ারের ওপর সমাহিত হয়ে বসে আছে আমাদের সেই জয়গোপাল বক্সী। তারও চেহারায় কোন পরিবর্তন হয়নি। চুলেও পাক ধরেনি। নিজের পরিচয় দিতে শুনি সেই ভাঙা-ভাঙা মিহি কণ্ঠস্বর। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "ঘোষদা, একটা চাকরি করে দেবেন?"

ভাবলাম বলি, "ফের বুঝি অ্যালেন সাহেবের সঙ্গে নাচতে গিছলেন? চাকরি যায় কেন?"

ঠিক সেই সময়ে সশব্দে গাড়ি থামিয়ে একজন খনিমালিক আমার দিকে এগিয়ে আসতে বক্সী শূন্যদৃষ্টিতে উঠে দাঁড়িয়ে কোথায় ছায়ার মত অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বক্সীও ফালতু আজকের দিনে।

আমি নালদার অফিসারদের ক্লাবের সভ্য। এদিকে এলে একবার ক্লাবে যাই আমাদের সেই সাবেক উলিবুরু ক্যাম্পের জায়গাটা দেখতে। গাছপালাগুলোকে কোন্ কালে সমূলে উপড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে তার কোন হদিস নেই। এখন সেখানে আছে ছোট-বড় বাংলো বাড়ি আর খেলার মাঠ। গবেষণাগারের খানিকটা শানবাঁধানো মেঝে এখনও নজরে পড়ে। অনুকূল বসুর ভাই বঙ্কিমবাবু একটা পুরনো কুঁড়েঘরের সংস্কার করে বাড়িয়ে এখনও কিছুটা স্মৃতিচিহ্ন বাঁচিয়ে রেখেছেন।

সূর্যাস্তের পর অন্ধকার ঘনিয়ে এলে যখন পাহাড় থেকে নেমে আসি তখন পশ্চিমের সেই আকাশজোড়া পর্বতপুঞ্জ জায়গায় জায়গায় আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে। গুয়া, বোলানী, কিরিবুরুর আলোকিত খনিপুঞ্জ আর নবগঠিত শহরগুলি-গুলি সেই একই আদিম অরণ্যানীর মধ্যে বিরাজ করছে কিন্তু কি বিপরীত তার প্রকৃতি। সেখানে বাড়িতে বাড়িতে বেতারযন্ত্রে ঝঙ্কৃত হচ্ছে বিশ্বের সংবাদ। রেডিওগ্রামে বাজছে দেশী-বিদেশী সঙ্গীত। পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস এসে গেছে ঘরের কাছে। বিশ্বজগৎকে দেখানো হচ্ছে ছায়াচিত্রে।

আমি ফিরে যাই চোরমালদার বনবাসে।

ভগবান অলক্ষ্যে থেকে হাসেন।

॥ ৩৫ ॥

আমাকে কাজের তাগিদে কলকাতা, ভুবনেশ্বর অথবা দিল্লীতে থাকতে হতো মাসের অর্ধেক দিন। কলকাতাতেই বেশী। একবার কোন একটি ইজারা সম্বন্ধীয় বিবাদ মেটাবার চেষ্টায় ভুবনেশ্বরে যেতে হলো। সরকারী অতিথিশালায় উঠেছি। আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যায় মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়কের সঙ্গে। তিনি যা বললেন তার সারার্থ হলো, "একটা চ্যালেঞ্জ আছে, সাহস থাকে এগিয়ে এস।"

দশ মিনিটের মধ্যে সরকারী খনি কর্পোরেশন পরিচালনার দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ফিরে এলাম।

টালাক কোম্পানির অংশভাগ বিক্রি করে দিতে হলো। টাকার দিক থেকে লোকসান হলো অনেক। সব চেয়ে বেশী মনঃকষ্ট পেলাম বনের মধ্যে আমাদের সেই বাসাটিকে ফেলে আসতে। চার বছরের নিবিড় সহবাসে যাবতীয় উদ্ভিদ ও

প্রাণীর সঙ্গে অনুরাগের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, আকস্মিকভাবে নিষ্পত্তি হয়ে গেলো তার।

চ্যালেঞ্জ-এর গুরুত্ব বুঝিয়ে বলতে হয়নি আমাকে। কে না জানতো সারা ভারতের পুঁজি ধাতুপাথরের অর্ধেক আছে উড়িষ্যায় আর এতাবৎকাল কলকাতা-নাগপুর রেলপথ ও তার দু-একটি শাখার উপর নির্ভর করে যে আকরগুলি খোলা হয়েছে তার বহুগুণ খনিজসম্পদ মজুদ আছে দাক্ষিণদিকে কোন বহির্গামী পথের অপেক্ষায়।

সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকা পর্যটন করতে গিয়ে দেখে এসেছিলাম ব্রাজিলের সুদূর অভ্যন্তর থেকে লোহাবোঝাই ট্রাক চলেছে রিও-র বন্দরে। খবর নিয়ে জানি যে রপ্তানি হচ্ছে জাপানে। বছর-তিনেক আগে জাপানে গিয়ে শুনে এসেছিলাম যে ব্রাজিলের লোহা সে-দেশে যেতে পারে না পানামা খালের জন্যে। এবার ব্রাজিলে গিয়ে শুনি সমস্ত মহাদেশ ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছে এক-একটা জাহাজে একসঙ্গে ষাট হাজার টন মাল বোঝাই-এর ব্যবস্থা করে।

দেশে ফিরে এসে বলে বেড়ালাম আমাদের বন্দরে বড় জাহাজ নিয়ে আসবার ব্যবস্থা না করলে রপ্তানির বাজার হারাতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, একমাত্র পারাদ্বীপ বন্দরেই ষাট-সত্তর হাজার টন লোহা বহনকারী জাহাজের আসা-যাওয়া সম্ভব হবে। আমার কাজ হবে আভ্যন্তরীণ লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোম প্রভৃতি সকল প্রকার ধাতুপাথরের পুঁজিকে রপ্তানি আর স্থানীয় যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নে উন্মুক্ত করে দেওয়া।

প্রতিশ্রুতি পেলাম, পরিকল্পনা, কর্মীনিয়ন্ত্রণ ও খরচের দিক থেকে আমার থাকবে অবাধ স্বাধীনতা।

১৯৬২ সালের প্রথম দিকের কথা বলছি। উড়িষ্যার এই অদ্ভুত কর্মশক্তিসম্পন্ন উদ্যমশীল মুখ্যমন্ত্রীর সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অনেক গল্প শুনে এসেছিলাম। এবার কাছে এসে দিনের পর দিন চোখের সামনে দেখলাম আমলাতন্ত্রের চিরাচরিত জড়িমা পরিহার করে সামান্য কেরানী থেকে প্রধান সচিব পর্যন্ত সকল কর্মচারীই সেই মহান পরিকল্পনার সাফল্যের জন্যে সমানভাবে উদ্যোগী হয়ে পড়েছে।

আমার কাজের ক্ষেত্র ছড়িয়ে পড়লো সারা উড়িষ্যায়। দুর্গম দুরারোহ অরণ্যানী তোলপাড় করে ফেললাম খনিজ পদার্থের খোঁজে আর উৎপাদন বৃদ্ধির

চেষ্টায়। জনবিরল পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রশস্ত পথ কেটে যুক্ত করলাম রেলপথ অথবা পারাদ্বীপগামী নতুন এক্সপ্রেস রাস্তার সঙ্গে।

দৈতারী লোহার আকরকে যন্ত্রীকরণের প্রস্তুতিতে আমিই সানন্দচিত্তে গাছপালা ও পশুপাখির উৎখাত-যজ্ঞে পৌরোহিত্য করি।

যে রাজনৈতিক দুর্যোগের ফলে আমাদের সকল উদ্যোগ সহসা স্তিমিত হয়ে যায় জঙ্গলের কাহিনীতে তার স্থান নেই।

আমি বলতে চাই সেই সব ছেলেমেয়েদের কথা যাদের পাঠিয়েছিলাম সুদূর নির্জন ক্যাম্পে ক্যাম্পে।

তরুণ জিওলজিস্ট ও মাইনিং ইঞ্জিনীয়ারদের সহধর্মিণীদের কথা আগে বলি। এঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন উড়িষ্যার সংরক্ষণশীল মধ্যবর্তী পরিবারের মেয়ে। একান্নবর্তী বড় পরিবারে বিগতযুগের মা-ঠাকুমার আওতায় মানুষ এই মেয়েদের ভয়-ভাবনা সব কিছু সংস্কার ঝেড়ে ফেলে স্বামীর ঘর করতে যেতে হতো ক্যাম্পে ক্যাম্পে। পরিদর্শনে বেরিয়ে আমার প্রথমেই নজরে পড়তো তাঁরা কেমন স্বচ্ছন্দ আয়াসে ক্যাম্পবাসী সকলকেই আপন করে নিয়েছেন। এঁদের উপস্থিতিতে যেন ক্যাম্পের জীবন স্বতঃই আনন্দময় ও সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠেছে। দৈতারীর প্রস্তুতির প্রথম দিকে অনেক সময়ে গাড়ি যাতায়াতের পথ বন্ধ থাকায় ক্যাম্পবাসীর কষ্টের অন্ত ছিল না কিন্তু পরিকল্পনার গুরুত্বের কথা ভেবে তারা কখনও নিরুৎসাহ হয়নি। আদিম অরণ্যের আবরণকে অপসারণ করে গুছিয়ে বসবার অবসর হয়নি। কটক ও ঢেঙ্কানাল জেলার মধ্যবর্তী তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত লোহার আকরকে জঙ্গলমুক্ত করে যুক্ত করা হলো কেওঞ্জর-জাজপুর রোড রাস্তার সঙ্গে। ক্যাম্প পড়েছে ষোলশ' ফুট উঁচু এক ঘন জঙ্গলাকীর্ণ উপত্যকার ওপর। সেখানে বাঘ ও হাতির গতিবিধি অবাধ। নির্বিবাদে ঘুরে বেড়ায় তারা। উভয় দিক থেকে কোন বিরোধ নেই। কর্মীরা সকলে কাজের উন্মাদনায় মত্ত। বন্দুক আছে সকলের কিন্তু শিকার করে বেড়াবার শখ বা সময় নেই। বুনো শুকর ও হরিণও দেখা দিয়ে যায়, কিন্তু খাদ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছে জাজপুর রোডের বাজার আর পলাশপালের হাট থেকে। সে দায়িত্ব নিয়েছি আমি। ট্রাকটর আনিয়েছি পার্বত্য জলধারা পারাপারের জন্যে। বাইরের শিকারান্বেষীরা সরে গেছে সুকিণ্ডার দিকে, আমাদের পাহাড়ের অপর পারে।

কাছাকাছি একমাত্র আদিবাসীদের গ্রাম তালপাদা হচ্ছে জনবিরল।

বর্ষা শুরু হবার আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসপেকটিং বিভাগ তাদের যন্ত্রপাতি

ও ক্যাম্প গুটিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যায়। আমাদের ছেলেরা সভ্য জগৎ থেকে দীর্ঘ সময়ের মত বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা সত্বেও থেকে যায় একরকম নির্বাসনে। তারা জানে দেশের কল্যাণে এ কৃচ্ছ্রস্বীকার অনিবার্য। কাজ এগিয়ে যায় সমান গতিতে।

বোলানীর দিলীপ বসু চিঠি লেখে খনিঅঞ্চলের আর এক প্রান্ত থেকে—"এখন এখানে পুরোদমে বর্ষা চলেছে। বর্ষার শুরুতে উত্তর-উড়িষ্যা জুড়ে যে রোজো উৎসব হয় আপনি ভোলেননি নিশ্চয়। এখনও ঐ উৎসবের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা দেখতে পাই। মেঘ ঘন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের রঙ নিবিড় নীল থেকে কালোতে বদলায়, মাঠগুলো হয়ে ওঠে সবুজ। তারই কোলে রঙিন বেশবাসে সজ্জিতা মেয়েদের দোলনাতে ওঠা-নামা দেখতে ভারী সুন্দর লাগে।

একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বর্ষাটা কোথায় সুন্দর? কোন দ্বিধা না করে বলে দিলাম, "এই জামদা-কয়ড়া পাহাড়ের উপত্যকায়। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে নামা মেঘ, দূর থেকে সরব বৃষ্টির তালে তালে এগিয়ে আসা, দিগন্ত মুহূর্তে মিলিয়ে যাওয়া যত দেখি ততই ভালো লাগে।"

আমারই মনের কথা। আমি ফিরে যাই সেই তরুণ বয়সে। সানন্দ বিস্ময়-বিজড়িত সেই দিনগুলি এখনও সুস্পষ্টভাবে স্মৃতির পর্দায় আঁকা। মাঝে মাঝে বর্ষার জলে স্ফীত নালা-নদীর ধারে আটকে পড়ে পরিদর্শনের সাথী রামচন্দ্রনকে গল্প বলি:

সেদিন বর্ষার জল নেমে গেছে খবর আনিয়ে আমাদের দৈতারী থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হলো। রামচন্দ্রন জীপগাড়ির সারথি। আমাকে পাশে তুলে নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে নামতে নামতে বলছিলেন যে, তিনি আমার যৌবনকালের বিপজ্জনক জীবনকে ঈর্ষা করেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে শোনা গেলো হাতির তীব্র বৃংহণনাদ। পিছনের দুজন আরোহী ড্রাইভার ও খালাসী আর্তকণ্ঠে বললে, "দুটো হাতি, একটা পিছনে।"

রামচন্দ্রন প্রশ্ন করলেন, "কি করবো? এই ঘোরানো খোঁচা খোঁচা পাথর-বার-করা গড়ানে পথে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব—"

বললাম, "নিঃশব্দে গড়িয়ে নেমে যাও—"

হাতির ক্রুদ্ধ নিনাদ কাছে এগিয়ে আসতে পিছনের আরোহীদ্বয় আতঙ্কে খোলা জানলা থেকে সরে আমাদের ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়লো। রামচন্দ্রন অবিচলিত দৃঢ়হাতে স্টীয়ারিং-এর চাকা ধরে নামিয়ে নিয়ে চললেন গাড়ি। বাকি

সকলে নিঃশব্দে, নিঃসাড়ে বসে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছি। কিছুদূরে সমতল জায়গায় পৌঁছে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেলো। সামনের একটি চাকার মধ্যে কিছু একটা ঢুকে বাতাস বেরিয়ে গিয়ে গাড়ি অচল হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ থেমে যখন দেখি হাতি পেছু নেয়নি তখন আমরা চাকা বদল করতে নামলাম।

রামচন্দ্রনকে বললাম, "অ্যাডভেঞ্চারের আশা মিটেছে? আমাদের সময় জীপগাড়ি ছিল না তাই আরও নিরাপদ ছিলাম। গল্প বললে মনে হয় না-জানি কত বিপজ্জনক!"

দুই বছরের মধ্যে বিপুল হারে গাছ কাটা আর বারুদ দেগে পাথর ওড়ানোর কাজ শুরু হয়ে গেলো। মান্যগণ্য ব্যক্তিদের জন্যে তৈরি হলো ঠাণ্ডা ঘরযুক্ত মনোরম বাংলোবাড়ি। দেশ-বিদেশ থেকে নতুন নতুন মানুষ এসে নৈসর্গিক পরিবেশের তারিফ করে যায়। তাদের আপ্যায়নে অনেক সময় আমাকেও হাজির হতে হয়। ঝলমলে বিজলী বাতিতে আলোকিত বারান্দায় পানীয় হাতে বসে দেখি নিচের দিকে দূরে দূরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কর্মীদের কোয়ার্টার্সে টিমটিম করে আলো জ্বলে। কানে আসে অস্ফুট শিশু-কণ্ঠধ্বনি।

মন বিক্ষিপ্ত হয়। ভাবি কোনও কর্ম-পরিকল্পনার কেন্দ্র বড় হয়ে গেলে কর্মীদের মধ্যে পদমর্যাদাবোধ এমন প্রকট হয়ে পড়ে কেন? ছোট ছোট ক্যাম্পের সমতাবোধ এখানে নেই কোন্ কারণে?

নিজের প্রতি নজর পড়লে বুঝতে পারি আমার সহৃদয়তার মূলে আছে পৃষ্ঠপোষকতার অহঙ্কার ছাড়া আর কিছু নয়। আমিও এই বড় ক্যাম্পে এসে ভি আই পি শ্রেণীভুক্ত অতিমানুষ হয়ে যাই। এখানকার গাছপালার প্রতিও আমার মমতা নেই। এই বাংলোর সামনেকার গাছপালা নির্মমভাবে কাটিয়ে ধাপে ধাপে নালা পর্যন্ত কয়েকটি তৃণখচিত লন ও ফুলের কেয়ারি বানানো হয়েছে আমারই নির্দেশে।

অতীতের স্মৃতির মধ্যে ডুবে থাকতে চেষ্টা করি।

শেষ